

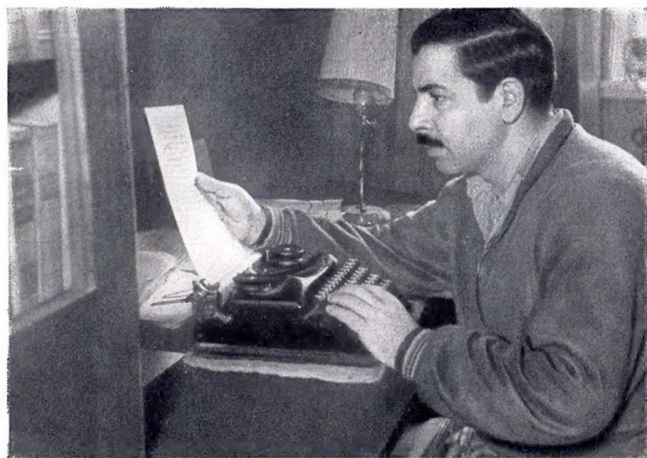
হাসান সেইদবেইলি

টেলিফোনের মেয়ে

ছোটখাটো রোগা একটি মেয়ে, মুখে তার বিষণ্ণ হাসির রেশ, চোখজোড়া শিশুর মতো সহজ সরল, কারখানার টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জে কাজ করে। একদিন হঠাৎ ইয়ারফোনে বেজে উঠল পুরুষের পরুষ কণ্ঠস্বর... এভাবে উপন্যাসের শুরু। লেখক হাসান মেহ্‌তি-ওগলি সেইদবেইলির বয়স কম, কিন্তু তিনি এরিমধ্যে জনপ্রিয়।

এ গল্প পাঠককে নিয়ে যাবে ককেশাস পাহাড়ের প্রান্তে, কাস্পিয়ান সমুদ্রতীরে, যেখানে দক্ষ ও অধ্যবসায়ী আজেরবাইজানীয় জাতির বাস। সেখানে কারখানার বৃহৎ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবারে স্থান পেল কিশোরী মেহ্‌রিবান। এই প্রথম সে প্রেমে পড়েছে, জীবন ভরে উঠেছে নানা স্বপ্ন আর ভাবনায়, নতুন অর্থ পেয়েছে। তার সুখ দুঃখের ভাগ নিন পাঠক।

আজেরবাইজানের নতুন নতুন তৈল স্তর থেকে সমাজতন্ত্রের বছরগুলিতে ফোয়ারা-ধারায় উৎসৃত অসংখ্য তৈল স্রোতের মতোই আজেরবাইজানীয় সোভিয়েত সাহিত্য বহুমুখী ও সূর্যালোকে দীপ্ত। সেইদবেইলির উপন্যাস এই ঝর্ণাধারায় একটি মাত্র বিন্দু হতে পারে, কিন্তু সে বিন্দুতে ধরা পড়েছে একটি দীপ্ত রঙিন জগৎ। এ জগতে বাস করে আমাদের সমকালীনরা — সোভিয়েত প্রাচ্যের লোকেরা।



সোভিয়েত সাহিত্যের গ্রন্থমালা

হাসান সেইদবেইলি

টেলিফোনের মেয়ে

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

মূল রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ: সমর সেন

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: আ. ইয়েরাসভ

СЕИДБЕЙЛИ

ТЕЛЕФОНИСТКА

"...সবসময় এবং সবখানে, সারা জীবন যদি শুধু ভালো জিনিস রেখে যাও — ফুল, সুচিন্তা, নিজের সম্বন্ধে ভালো ধারণা — তাহলে তোমার জীবন স্বচ্ছন্দ ও প্রীতিকর হবে।

তখন মনে হবে তোমাকে লোকের দরকার আর এই অনুভূতিটুকু তোমার অন্তরকে সমৃদ্ধ করবে।

মনে রেখো, নেওয়ার চেয়ে দেওয়াতেই আনন্দ বেশি ..."

(ছেলেকে লেখা গোর্কির চিঠি থেকে)

১

মেহ্‌রিবানকে প্রথম দেখলে সবাই কেন জানি না ঘুরে আর একবার দেখবেই। লোকের কৌতূহল ও আগ্রহভরা দৃষ্টি অবশ্য তার নজরে পড়ে না।

ছোটখাটো পাতলা চেহারা মেহ্‌রিবানের। লঘু পায়ে চলে, পায়ের শব্দ বলতে গেলে শোনা যায় না। পাতলা ছোট ফিকে বাদামী রঙের বিনুনি, মুখটা লম্বাটে আর ফ্যাকাশে, একটুখানি যেন করুণ। মুখের কোথায় যেন সামান্য একটা ত্রুটি আছে — হাসলে রুগ্ন মনে হয়, ঠোঁটের কোণ বেঁকে যায়। হাসে অবশ্য কমই। উত্তেজিত হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে নাসারন্ধ্র অল্প অল্প কাঁপে। কিন্তু মুখের মধ্যে সবচেয়ে যেটা করুণ সেটা হল মেহ্‌রিবানের চোখ। ভোমা ঘন, অসমান, মনে হয় এঁটে আছে, যেন এইমাত্র এক পশলা কেঁদেছে। নীলচে কালো চোখদুটি সর্বদা বিষণ্ন, প্রায় বিষাদগ্রস্ত। তাতে এখনো শিশুসুলভ সরল একটা বিস্ময়ের ছাপ। বোধহয় এ জন্যই লোকে ঘুরে তাকায়।

এই তো কারখানার প্রাঙ্গণ থেকে একটি ছোকরা শ্রমিক বেরিয়ে এসে মেহ্‌রিবানকে দেখিয়ে সঙ্গিনীকে জিজ্ঞেস করল:

'এটি কে?'

'আমাদের টেলিফোনে কাজ করে।'

'আগে তো দেখিনি।'

'আমি দেখেছি বার দুয়েক। ওদের এক্‌স্‌চেঞ্জের জানলা আমাদের ডিপার্টের আঙিনার ঠিক সামনে। ও সবে ঢুকেছে।'

কারখানা-অফিসের দীর্ঘ আলোকিত করিডর হয়ে গিয়ে মেহ্‌রিবান বাঁ দিকে ঘুরে একেবারে শেষের দরজাটি খুলল। টেলিফোন-যন্ত্রে সবাই ব্যস্ত, তাই তার নমস্কারের প্রত্যুত্তর মিলল না। খোলা জানলার পাশে যে মেয়েটি কাজ করছিল সে উঠে মেহ্‌রিবানকে জায়গা ছেড়ে দিল। সুইচবোর্ডের এদিকে ওদিকে আলো জ্বলে উঠছে। ইয়ারফোন চাপিয়ে ক্ষীণ গলায় মেহ্‌রিবান জবাব দিতে শুরু করল: "তিন নম্বর ... তিন নম্বর ...।" লাইন জুড়ে ভীরু কণ্ঠস্বরে — "কথা বলুন!" বা "এনগেজ্‌ড্‌!" তার ক্ষীণ গলার স্বর মিলে গেল অন্য মেয়েদের কর্মপটু একটানা সুরে। বান্ধবীরা আরো পাকা, ওদের ভঙ্গী সঠিক, মসৃণ। ক্ষিপ্রভাবে সুইচবোর্ডে হাত চলে, বিশেষ একটা ছন্দে প্লাগ খোলে আর বসায়, আর সে গতি সুন্দর মেলে সংক্ষিপ্ত শব্দগুলির সঙ্গে: 'চার নম্বর। কাকে চাই? চার নম্বর। এনগেজ্‌ড্‌। ছ নম্বর। কথা বলুন। দু নম্বর। কোনো সাড়া নেই। দু নম্বর। কথা বলুন।' এ সব কণ্ঠস্বরের মিলিত ছন্দে

মাঝে মাঝে বেখাপ্পা শোনা যায় মেহ্‌রিবানের কম্পিত গলা: 'তিন নম্বর... তিন নম্বর...' সবাইকে জবাব দেবার কত চেষ্টা তার, তবু দেরি হয়, ভুল হয়, দেয় বেঠিক নম্বর। নানা গলায় রাগের সুর আরো বেসামাল করে তাকে; সুইচবোর্ডে প্রতি মুহূর্তে জ্বলে-ওঠা আলো ঝাপসা হয়ে যায় চোখের সামনে।

প্রথম দৃষ্টিতে হয়ত মনে হবে কারখানার টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জের কাজ এমন কিছু জটিল নয়। কিন্তু আসলে কাজটা অত্যন্ত কঠিন, সর্বদা দরকার একান্ত সজাগতা।

মেহ্‌রিবান কাজ করে প্রকাণ্ড একটি তৈল শোধনাগার কারখানায়। কত বিভিন্ন ডিপার্ট, বিভাগ, গবেষণাগার আর তৈলাধার। শ্রমিকের সংখ্যা কয়েক হাজার। এই জটিল বিরাট সংস্থানে ক্রমাগত সঠিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন। আর সে ব্যবস্থা মূর্ত হয়েছে টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জের ছোট্ট ঘরে। কিন্তু শুধু কারখানার ভেতরকার যোগাযোগ রক্ষাতেই মেয়েদের কাজ শেষ নয়। টেলিফোন কল আসে অন্যান্য কারখানা ও অফিস, ঘাট, মালের গুদাম থেকে; আবার এ কারখানা থেকে লোকে টেলিফোন করে তাদের — তার মানে প্রত্যেকটি টেলিফোন-অপারেটর সেকেণ্ডে দু-তিনটে কল পায়। তাই প্রত্যেক সিফ্‌টের ভার থাকে একটি করে মেয়ের হাতে, যারা ক্লান্ত হয়ে যায় তাদের বদলি করে সে।

কিছুক্ষণ আগে যে মেয়েটি মেহ্‌রিবানকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল সে দেখল মেহ্‌রিবান অকূল পাথারে। তাড়াতাড়ি

এসে সুইচবোর্ডের সামনে বসে সে ঠেলা সামলাল। মেহ্‌রিবানের বিবর্ণ গাল তখন লাল হয়ে উঠেছে, গলা শুকিয়ে এসেছে। অন্য লোকের কণ্ঠস্বর তখনো তার কানে বেজে চলেছে — কেউ দাবী করছে, কেউ বা ঝগড়া, কেউ অনুরোধ জানাচ্ছে, কারো বা সুরে প্রভুত্বের ছাপ...

পাকা চাকরি পাবার আগে মেহ্‌রিবানকে এক মাস পরীক্ষামূলকভাবে থাকতেই হবে। যা নিয়ম তাই। এ কঠিন কাজ কি সে পেরে উঠবে? তার মনে ভয়, অসম্ভব ভয়...

মেহ্‌রিবান জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। মুখে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক। প্রাঙ্গণে তাকিয়ে দেখল। সাদায় রঙ করা বিরাট সব যন্ত্রপাতি, ধাতুর প্যাঁচানো গ্যালারিতে ঘেরা উঁচু তৈলাধার, অসংখ্য পাইপের ছড়াছড়ি সর্বত্র। তাছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। হঠাৎ তার মনে হল, ঘণ্টাখানেকের জন্য টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কী হবে? তাহলে জনহীন প্রাঙ্গণটা উইঢিবির মতো জীবন্ত হয়ে উঠবে — লোকে ছুটবে এদিক-ওদিক, সাবধান করা চাই, অনুরোধ করা চাই, আদেশ দেওয়া চাই, ধমকানো চাই — কী বিশৃংখলা যে শুরু হবে। কারখানার জন্য টেলিফোনের ছটি মেয়ে তাহলে কত না করে! সত্যি, কাজটা কঠিন, বড়ো কঠিন...

মেহ্‌রিবানের চুলে, উষ্ণ গলায় ফুরফুরে হাওয়ার ছোঁয়া। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে. কেঁপে উঠল নাসারন্ধ্র।

ওর বদলি-মেয়েটির মতো সে কাজ করতে পারবে? পারবে নাই বা কেন? দুজনের মধ্যে কী তফাৎ? সুইচবোর্ডের ও প্রান্তটায় নাজিলা গুসেইনভা বসে। বেশভূষায় মেহ্‌রিবানের মতোই সে সর্বদা পরিষ্কার, ফিটফাট। বেশ লম্বা গড়ন, চোখদুটি উজ্জ্বল বাদামি রঙের; সুন্দর কালো চুল। প্রতি দিন প্রাঙ্গণে একটি ছেলে মেলে নাজিলার সঙ্গে। নাজিলার চেয়ে বেঁটে। নাজিলা বলে ও হল তার ভাই। হয়ত তাই, কে জানে। নাজিলার পাশে হাসিখুশি কোঁকড়াচুল মাহ্‌বুবা নাজাফ্‌জাদে। সর্বদা ঝলমল করে মেয়েটি, ওর মধ্যে লুকোচুরি কিছু নেই, যা ঘটে সব বলে সখীদের। লেইলা মাদাতভা — তার বিয়ে হয়েছে এক বছর। পোয়াতী নিশ্চয়ই — নিজের জায়গায় একসঙ্গে অনেকক্ষণ বসতে পারে না। স্বামীটি প্রায়ই ফোন করে। মনে হয় দুজনের মধ্যে বেশ ভাব। শ্যামবর্ণা সিমুজার'এর বুকে 'রেড স্টার অর্ডার'— মেডেলের জৌলুস ম্লান হয়ে এসেছে, কয়েকটা জায়গায় চটা। সিমুজার চলে অল্প খুঁড়িয়ে। ফ্রণ্টে ছিল সে। কুমারীর বয়স অনেক দিন পার হয়েছে। হয়ত তাই ছেলেদের নিয়ে কথাবার্তা তার বিশেষ অপছন্দ। সবায়ের চেয়ে তাড়াতাড়ি, সবায়ের চেয়ে ভালো কাজ করে সে। ভালিদা গাদিরজাদ'এর বয়স সবচেয়ে কম। বারবার তাকায় জানলার দিকে। হয়ত যন্ত্রচালক ইবাদ আবার প্রাঙ্গণে হাজির হবে? চঞ্চল, চটপটে চোখ ভালিদা'র, নাকটা মজার খ্যাঁদা। ওর খিল খিল হাসি এ ঘরে প্রায়ই শোনা যায়, কাজের ব্যাঘাত ঘটায়। আর

একটি মেয়ে আছে। জামিলিয়া মানাফভা, বদলির কাজ তার হাতে। পৃথিবীতে তার একমাত্র প্রিয় জিনিস — পড়া। ফাঁক পেলেই কোণের সোফাটাতে চলে যায় বই হাতে। ক্রমাগত পড়ে চোখের মাথা খেয়েছে — পড়ার সময় মুখের এত কাছে বইটা ধরে যে পাতাগুলো মুখে ঠেকে আর কি।

ওরা সবাই সহজ সাধারণ মেয়ে। ওরা এ কাজটা করে ঠিকভাবে, তার মানে মেহ্রিবানও পারবে।

মেহ্রিবানকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে জামিলিয়া আবার কোণের সোফাটায় গিয়ে বসল — আফ্রিকার উপকূলে এসে পড়েছে জাহাজ, যাত্রীদের সঙ্গে তার অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ভ্রমণে ছেদ পড়লে চলবে না।

খোলা জানলায় চওড়া-কাঁধ দীর্ঘদেহ একটি যুবক এসে দাঁড়াল। হাতে তেরপলের প্রকাণ্ড বড়ো দস্তানা। হাড় উঁচু মঙ্গোলীয় মুখের ঘাম হাতের চেটোয় মুছে আস্তে আস্তে ডাকল:

'ভালিদা!'

পাখির মতো চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ভালিদা জামিলিয়ার হাত থেকে বইটা ছিনিয়ে তাকে ঠেলে দিল সুইচবোর্ডের সামনে। তারপর ছুটে গেল জানলায়।

ঘরে এল পেট্রলের গন্ধ মাখা বাবলা ফুলের সুবাস।

'ইবাদ! জানো, সকালে মা'র কী গজগজানি...'

'কেন?'

এক্‌স্‌চেঞ্জের জানলা থেকে প্রাঙ্গণে ফেটে পড়ল ভালিদার মুখর হাসি:

'বললেন, "তুই দেখছি কাক-ডাকা সকালে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছিস!"'

'তুমি কী বললে?'

'আমি বললাম, "রাত্তিরে টেলিফোনের একটি মেয়ের হয়ে কাজ করতে হল যে।"'

আবার হিহি করে হেসে উঠল ভালিদা, তারপর আঙুলের ইশারায় শাসাল ইবাদকে। যেন কাজে ব্যাঘাত দিচ্ছে ইবাদ, সে নয়।

'শ্‌... শ্‌... শ্‌!.. সত্যি কাল দুজনে বড্ড বেশি বেড়িয়েছি। সবকিছুর একটা সীমা আছে। বরং কাল সিনেমায় যাব, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। রাত্তিরে আবার কাজ তো।'

'সিনেমায় কী হবে। তার চেয়ে পার্ক ভালো। শুধু তাড়াতাড়ি এসো, নইলে আমাদের জায়গা দখল হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা বেশ। এবার ভাগো!'

'ভালিদা!'

'কী?'

'দু মাস পর আমার পালা আসবে — "মস্কভিচ্‌" পাব। একসঙ্গে ছুটি নেবার চেষ্টা করা চাই। তোমাকে নিয়েই প্রথম গাড়ি চালাবার ইচ্ছে। একেবারে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত যাব! পাহাড়ে পথ ধরে। শুনে কেমন লাগছে? খুশি তো?'

আনন্দে কিশোরীর মতো লাফিয়ে উঠল ভালিদা।

'ইবাদ, ইবাদ! খাসা ছেলে তুমি! কী চমৎকার লোক! তাহলে তো গরমের পোষাক আর একটা সেলাই করতেই হবে। শুনেছি ও সব জায়গায় লোকে বেশ ফিটফাট!' হঠাৎ তার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল: 'কিন্তু মা'কে কী বলব?'

'আমিই তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

ভালিদা ভয় পেল:

'না, না, সে কী?'

মেহ্‌রিবান শেষ শক্তিটুকু কাজে লাগাচ্ছে। সুইচবোর্ডে আলোর দপদপানি বেড়ে চলেছে তো চলেছে। একটা কলের উত্তর দিতে না দিতে সুইচবোর্ডের বিভিন্ন প্রান্তে একসঙ্গে আরো তিনটি অধৈর্য আলো। সেগুলোর উত্তর দেবার আগেই আরো পাঁচটা। ক্রমাগত জ্বলে-ওঠা আলো আবার ঝাপসা হয়ে গেল চোখের সামনে। হতাশায় মেহ্‌রিবান তাকাল জামিলিয়ার দিকে। সোফায় কেউ নেই, খোলা বইটা পড়ে আছে শুধু। ভালিদার জায়গায় জামিলিয়া বসেছে, ভালিদা তখনো জানলায় দাঁড়িয়ে। ওর দরকারি কথাবার্তায় ব্যাঘাত দেবার সাহস হল না মেহ্‌রিবানের। আবার তাকাল জামিলিয়ার দিকে; সে সময় ইয়ারফোনে একটি পুরুষের জোরালো গলা ফেটে পড়ল:

'হাবা! গ্যারাজ দিচ্ছ কেন? আমি... তেল মাপার তিন নং ডিপো চাই!'

মেহ্‌রিবান শিঁটিয়ে উঠল, কেউ যেন গায়ে ছুঁচ ফুটিয়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কাঁপা স্খলিত গলায় বলল:

'মাপ করুন... আমি... আপনি...'

কিন্তু সে গলা ফেটে পড়ল:

'অনেক বকর বকর শুনেছি! শীগগির তিন নং ডিপো দাও!'

কিছুতেই ঠিক নম্বর খুঁজে পেল না মেহ্‌রিবান। যন্ত্রণাকর বিরতি কোনক্রমে ভরাবার জন্য কৈফিয়ৎ দিল:

'দেখুন, এমন করে আমাকে হুমকি দেবেন না। আমি এখানে নতুন এসেছি।'

'ফুলের ঘায়ে মূর্ছা দেখছি! নতুন এসেছি! এটা কি স্কুল নাকি? বলছি তিন নং ডিপো দাও, নইলে হয়ত কিছু একটা বিপদ ঘটবে!'

কিন্তু কনেক্‌সন দিতে পারল না মেহ্‌রিবান। চোখের সামনে আবছা কুয়াশা, তার মধ্যে আলোর দপদপানি নজরে যেন পড়ে না। অন্ধের মতো সুইচবোর্ড হাতড়ে কোনক্রমে কান্না সামলাল।

এবার ভালিদা এল তার জায়গায়।

দুপুরের খাবারের ছুটি। কথাবার্তা কমে এসেছে, আলো জ্বলছে কম, মেয়েরা পেল বকবকানির ফুরসৎ। একমাত্র জামিলিয়া কথাবার্তায় যোগ দিল না। নিজের কোণে বই হাতে বসে ভয়ংকর কুমীর বাঘ আর হাতীর দেশে তার যাত্রা আবার শুরু হল।

মেহ্‌রিবানকে আরো বিবর্ণ দেখাচ্ছে। মুখে ভয় আর বিভ্রান্তির একটা ছাপ। একটু হাঁপাচ্ছে, নাসারন্ধ্র কেঁপে উঠল প্রায় অলক্ষিতে।

'ভেঙে পড়ো না,' হালকা সুরে বলল ভালিদা। 'কাজ রপ্ত হয়ে যাবে।'

'তুমি আর সান্ত্বনা দিতে যেও না। সোহাগ করে ওর মাথার নিচে বালিশ গোঁজার কী আছে!' কাটা কাটা গলায় বলে উঠল সিমুজার। মেহ্‌রিবানের দিকে না তাকিয়েই আরো বলল: 'এখানে খুব হুঁশিয়ার থাকা দরকার।'

সোফায় একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে মেহ্‌রিবান অস্ফুট স্বরে বলল:

'মাপ করবেন...'

'আমাদের কাছে মাপ চেয়ে কী হবে?' আগেকার মতো শুকনো আর কঠিন গলায় জবাব দিল সিমুজার। 'মাপ করার মালিক হল সে।'

ভীত কণ্ঠে শুধাল মেহ্‌রিবান:

'তিনি কে?'

'চার নং ডিপার্টের ম্যানেজার।'

টিফিন শেষ হল। সুইচবোর্ডে আবার ঘন ঘন আলো। নিজের সুইচবোর্ডের সামনে বসল মেহ্‌রিবান।

সিফ্‌ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত বার কয়েক সেই মানুষটির কণ্ঠস্বর কানে এল মেহ্‌রিবানের।

শত শত কণ্ঠস্বর থেকে তার গলা চিনতে পারে সে। যতবার শোনে, কাঁপুনি ধরে।

এটা স্পষ্ট যে আজ চার নং ডিপার্টের কাজ ঠিক চলেনি—ম্যানেজারের মেজাজ সপ্তমে। ভয় পেলে বার বার ভুল করে মেহ্‌রিবান, লোকটি চেঁচায়, শাসায়, রাগে আত্মহারা হয়ে যায়। ১ নং যন্ত্রাগার চাইল, মেহ্‌রিবান যোগ করল ক্লাবের সঙ্গে, ভুল বুঝে সঙ্গে সঙ্গে মাপ চাইল। কিন্তু মাপ চেয়ে কোনো লাভ নেই, কেননা চার নং ডিপার্টের ম্যানেজার তখুনি কল বদলে সহকারী ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। কনেক্‌সন দিল মেহ্‌রিবান। ওর নামে নালিশ করবে বোধ হয়! ভয়ে থরথর কেঁপে উঠল সে। ভুল করেনি। চার নং ডিপার্টের ম্যানেজার সহকারী ডিরেক্টরকে তার বিষয়ে যা বলল সব কানে গেল:

'আপনাদের টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জে কী ব্যাপার? পাঠশালা খুলেছেন বুঝি? এ ভাবে কাজ করা চলে না, বুঝলেন বন্ধু! জানি আপনাদের লোক কম, কিন্তু উপযুক্ত কাউকে জোগাড় করুন। এ গবেটটি কে? আমি চাই একটা নম্বর, আমাকে দিচ্ছে অন্য একটা! এর একটা বিহিত করতে হবে আপনাকে।'

মেহ্‌রিবান চুপচাপ উঠে করিডরে গেল। সিফ্‌ট শেষ হয়েছে। জোর গলায় কথা বলতে বলতে রাতের সিফ্‌টের মেয়েরা যে যার জায়গা নিচ্ছে।

মাহ্‌বুবা ও ভালিদা করিডরে দৌড়িয়ে এসে গেল

মেহ্‌রিবানের কাছে। নেমে আসা চূর্ণ কুন্তল গলার রঙীন সিল্কের রুমালে গুঁজতে গুঁজতে মাহ্‌বুবা জিজ্ঞেস করল:

'কী হল? আগেই চলে এলে কেন? কাউকে কিছু না বলেই ...'

মেহ্‌রিবান নিরুত্তর।

'আবার কিছু একটাতে ঘাবড়ে গেছ বুঝি?' হেসে বলল ভালিদা।

কোনো কথা বলল না মেহ্‌রিবান। মুখ বেঁকিয়ে মাহ্‌বুবা বলে উঠল:

'বেজার হবার কী আছে শুনি! তুচ্ছ ব্যাপারে মুখ ঝুলিয়ে থাকাটা আমাদের ভালো লাগে না।'

বিষণ্ণ ভাবে একবার মাহ্‌বুবা, একবার ভালিদার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে মেহ্‌রিবান বলল:

'ও বলল যে আমি গবেট। বলল, আমাকে ছাড়িয়ে দেওয়া দরকার ...'

'কে বলল?'

'কাকে বলল?'

'চার নং ডিপার্টের ম্যানেজার... সহকারী ডিরেক্টরকে বলল ...'

মাহ্‌বুবা অত্যন্ত বিচলিত। ঠোঁট শক্ত করে চেপে ভালিদার হাত ধরে টানল, দুজনে করিডরে আবার ফিরে দৌড়ল। এক্‌স্‌চেঞ্জ থেকে সিমুজার বেরিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে

অনেকক্ষণ কী কথাবার্তা চলল। কিছু না বলে শুনল সিমুজার, তারপর ফিরে এগিয়ে গেল। মেহ্‌রিবানের কাছে এসেও তার দিকে তাকাল না, চলে গেল।

সবাই রাস্তায় বেরিয়েছে। মাহ্‌বুবা আর ভালিদা মেহ্‌রিবানের কাছে এসে সান্ত্বনা দিল:

'ভয়ের কিছু নেই। কোনো ক্ষতি হতে দেব না আমরা। না পড়ে তো লোকে হাঁটতে শেখে না। আমরাও প্রথম প্রথম কত ভুল করেছি!'

রাস্তার বাঁক থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল ট্র্যামগাড়ি। ব্যস্ত হয়ে উঠল মাহ্‌বুবা।

'কাল আমাদের রাত্রে কাজ। দেখ, দেরি কোরো না যেন!' বলে লাফিয়ে উঠল ট্র্যামে।

কারখানা থেকে লোক বেরিয়ে আসছে, এ-ওকে ডাকছে। একলা একলা, জোড়ায় জোড়ায় বা দল বেঁধে সবাই বাড়িমুখো। কে যেন ডাকল ভালিদাকে। খুব সম্ভব ইবাদ। ভিড়ে নিজের বাপকে দেখতে পেয়ে সিমুজার খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল তার সঙ্গে। সেই লম্বায় মাঝারি ছেলেটি, যে নাজিলার সঙ্গে বরাবর মেলে, কাছে এসে তার হাত ধরল, দুজনে চলল একসঙ্গে। ভালিদা কোথাও যেন উধাও। দীর্ঘাকৃতি একটি যুবক লেইলার কাছে এসে তাকে এত সন্তর্পণে নিয়ে চলল যেন সে চিনেমাটির ফুলদানি, অসাবধানী স্পর্শে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। মেহ্‌রিবান তখনো প্রাঙ্গণে

দাঁড়িয়ে। রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল। রাস্তার আলো ঝুলছে কমলালেবুর মতো। চাঁদহীন অন্ধকার আকাশে তারার দপদাপানি। দেখে সুইচবোর্ডের আলোর কথা মনে হল মেহ্‌রিবানের। কোথা থেকে যেন বাষ্প-ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ ডাক ভেসে এল। কারখানাটা যেন বিরাট ঘুমন্ত একটা জানোয়ার। শান্তিতে জানোয়ারটার নিশ্বাস পড়ছে, মাঝে মাঝে ফোঁসফোঁসানি। তার বলিষ্ঠ নিশ্বাসে হাঁফ ধরেছে মেহ্‌রিবানের, মনমরা লাগছে ভয়ানক। ইচ্ছে হল ডিরেক্টরের কাছে গিয়ে বলে তখুনি যেন ছাড়িয়ে দেয়। কিন্তু হঠাৎ কানে স্পষ্ট বেজে উঠল মাহ্‌বুবার কথাগুলি: "আমরা যত দিন বেঁচে আছি কোনো ক্ষতি হতে দেব না!" আর কী যেন বলেছিল? "না পড়ে তো লোকে হাঁটতে শেখে না।"

ডিরেক্টরের কাছে গেল না মেহ্‌রিবান। ট্র্যামস্টপের দিকে চলল ধীরে ধীরে।

ততক্ষণে তার এবং আশেপাশের কারখানার প্রায় সব শ্রমিক বাড়ি চলে গেছে ট্র্যামে। সেজন্য ট্র্যামের যে গাড়িতে মেহ্‌রিবান উঠল সেটা বলতে গেলে ফাঁকা। দুটি ছোকরা শুধু একটা বেঞ্চিতে বসে। কণ্ডাক্টর নেই। আরোহী না থাকাতে সামনের গাড়িতে গেছে বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করতে।

পেছনের বেঞ্চিতে ক্লান্তিভরে বসে পড়ল মেহ্‌রিবান। ছোকরাদুটি নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কী যেন বলল, তারপর

ওদের একজন তুখোড় ভাব করে মেহ্‌রিবানের দিকে গিয়ে সামনের সীটটা দখল করল।

'কোথায় কাজ করো, দিদি?'

ক্রুদ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে অন্য জায়গায় উঠে গেল মেহ্‌রিবান।

পিছু ছাড়ল না ছোকরাটি।

'এত চটলে কেন? কী করেছি শুনি? অন্যদের চেয়ে আমরা এমন কিছু খারাপ নই — তাইতো মনে হয়; তুমি যেমন, আমরাও তেমন।'

ক্লান্ত চোখে মেহ্‌রিবান তার দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে ভর্ৎসনার ছাপ। তাতে ছোকরাটির গায়ে-পড়া ভাবটা হঠাৎ উবে গেল। বিব্রত হয়ে মাথার ক্যাপটা ঠিক করে, বেল্টটা কোমরে এ'টে, হেসে বলল:

'চটো না দিদি: ভেবেছিলাম একটু আলাপসালাপ করি।'

আস্তে আস্তে চোখ বুজল মেহ্‌রিবান; চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু। এক ফোঁটা গাল বেয়ে নামছে।

চুপচাপ উঠে ছোকরাটি বন্ধুর কাছে ফিরে গেল। আর ওরা এল না মেহ্‌রিবানের কাছে। শুধু অবাক হয়ে দূর থেকে দেখতে লাগল অদ্ভুত মেয়েটিকে।

মেহ্‌রিবানের বাসা বাকু'র পাহাড়তলিতে, পুরোনো তিনতলা বাড়ির দু-ঘরের একটা ফ্ল্যাটে।

উ'চু রাস্তা ধরে উঠে সি'ড়ি বেয়ে তিনতলায় গিয়ে দরজা

খুলে আলো জ্বালল মেহ্‌রিবান। ভয়ার্ত চোখ বুলিয়ে নিল ঘরটায়। সর্বদা তার মনে হত ঘরে আর কেউ যেন আছে। কিন্তু সে থাকে একলা। বুড়ি ঠাকুমা গত হয়েছেন দু মাস আগে।

জানলার কাছের টেবিলটায় একটা খাম। ছুটে হয়ত যেত সেদিকে, কিন্তু মনে পড়াতে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাবার চিঠিটা এসেছে দিন দশেক আগে।

রিগা থেকে লেখা। এরি মধ্যে বার কয়েক পড়া হয়ে গিয়েছে। বাবা লিখেছেন, তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে আসতে পারবেন না, কারণ তিনি অসুস্থ। লিখেছেন, কিছু দিন ভয়ানক কাজের চাপ পড়েছে। মনে করিয়ে দিয়েছেন তামারা'র কথা। মেহ্‌রিবানের সৎমা। চিঠির উপসংহারে সবচেয়ে জরুরী কথাটা আছে — বাচ্চারা বড়ো হচ্ছে, শীগগিরই স্কুলে পাঠাতে হবে, তার মানে খরচ বাড়বে। সেজন্য আগেকার মতো আর মেহ্‌রিবানকে টাকা পাঠানো যাবে না। মেহ্‌রিবান তো বড়ো হয়েছে, পা দিয়েছে আঠারোয়, এবার একটা কাজ খুঁজে নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।

সবকিছু পরিষ্কার। ছোট চিঠিটার মানে, বাবা তাকে ত্যাগ করেছেন। ব্যাপারটা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু চিঠিটা মেহ্‌রিবান ছেঁড়েনি, ফেলে দেয়নি। বাপের শেষ চিঠি। সে জানে, বাবা আর লিখবেন না। তবু বাপকে মেহ্‌রিবান ভালোবাসে। প্রায়ই মনে মনে কথা বলে তাঁর সাথে। তাঁর বুকে মাথা রেখে মিষ্টি কথা বলে।

দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে মেহ্‌রিবান চাপা কান্না কাঁদত। ফোঁপাত বাচ্চার মতো।

ঠাকুমা'র শ্রাদ্ধের পর টাকা ফুরিয়ে যায়, প্রতিবেশিনী নিসাবেইম'এর কাছে ধার করতে হল। এবার নিজের রোজগার থেকে ধার শোধ করতে হবে। বাবা তো আর পাঠাবেন না।

জন্মে মা'কে দেখেনি মেহ্‌রিবান। তাছাড়া তার জন্মের কয়েক মাস আগে থেকেই মা-বাবা ছাড়াছাড়ি হয়ে যান। তার জন্মের মূলে শুধু যৌবনের উদ্দাম একটা খেয়াল। ক্ষণিকের আকর্ষণকে দুজনে ভেবেছিল প্রেম। ভুলটা ধরা পড়তে সময় লাগেনি, তারপর বিচ্ছেদ।

মেহ্‌রিবানের ঠাকুমা অত্যন্ত ভুগতেন। কিডনির ব্যামোয় বেশির ভাগ সময় তিনি শয্যাগতা ছিলেন। মেহ্‌রিবানের বাবার অদ্ভুত একটা অভ্যেস ছিল — তিনি দু এক বছর অন্তর কাজ বদ্‌লে মেয়েকে নিয়ে যেতেন সঙ্গে। কখনো কুইবিশেভ, কখনো খার্কভ, কখনো লেনিনগ্রাদ।

সমবয়সীদের তুলনায় সর্বদা পিছিয়ে থাকত মেহ্‌রিবান। স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়াতে পড়াশুনো ঠিকমত হয়নি। তার জীবনে স্থায়ী কিছু ছিল না। সবকিছুতে দ্রুত ছেদ পড়ত — পড়াশুনোয়, স্কুলে অন্য মেয়েদের সঙ্গে চেনাশোনায়, সবকিছুতে। তার স্মৃতির টুকরোগুলোও তেমনি খাপছাড়া। আনন্দ সর্বদা ক্ষণস্থায়ী হত; দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস শুধু বিষাদ, ক্লান্তি আর

নিঃসঙ্গতার ভার। বাকুতে শেষবার যখন বাবা আসেন তখন তিনি তামারাকে বিয়ে করে যান রিগাতে, সস্ত্রীক সকন্যা। বাকুতে আজেরবাইজানীয় ভাষায় পড়াশুনো করত মেহ্‌রিবান, কিন্তু বাপের সঙ্গে সুদূরে অন্যান্য সহরে গিয়ে সেটা আর সম্ভবপর হত না; হয় উক্রেনীয় নয় রুশ ভাষায় পড়তে হত। তাই সবসময় সে পিছিয়ে থাকত। স্কুলে পড়ার সময় অতি কষ্টে সে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ওঠে।

তামারার দ্বিতীয় পুত্রসন্তান হল। রিগার ফ্ল্যাট বড়ো ঘিঞ্জি। মেহ্‌রিবান গেল বাকুতে, ঠাকুমা'র কাছে। তারপর দু বছর কেটেছে। মেহ্‌রিবান এখন সান্ধ্য স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে। তৈল শোধনাগার কারখানায় টেলিফোনের মেয়ে চায় শুনে সে একটা দরখাস্ত করে। তাকে জানানো হল যে পরীক্ষামূলক ভাবে তাকে নেওয়া হবে।

আজকের গণ্ডগোলে মেহ্‌রিবান বেজায় ভয় পেয়েছে। কাল রাত্তিরের সিফ্‌টে যখন কাজ করতে যাবে তখন হয়ত এক্‌স্‌চেঞ্জে ঢুকতে দেবে না, বলবে, 'এ কাজের যোগ্য তুমি নও।' বরখাস্ত করবে... চার নং ডিপার্টের ম্যানেজার তো সোজাসুজি বলেছে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত...

সিমুজার কেমনতর লোক! তার মতো কড়া আর হৃদয়হীন মেয়ের সাহায্য কি আশা করা চলে? মেহ্‌রিবান মাপ চাইতে কেমন উদাসীন ভাবে বলল: 'মাপ করার আমরা কে?' চার নং ডিপার্টের ম্যানেজারের কাছেও তো সে মাপ চায়... মাপ করলে

তার কী ক্ষতিটা হত? তবু লোকটা বলল তাকে ছাড়িয়ে দিতে। আর বলল কী অভাবিত্যভাবে। মেহ্‌রিবানের মনে হল ঘরটা অত্যন্ত গুমোট, দম আটকে আসছে। বারান্দার দরজাটা খুলে দিতে সমুদ্রের সোঁদা হাওয়ায় ঝরঝরে লাগল। দূরের উপসাগরকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরেছে আগুনের চিকচিকে জীবন্ত একটা জোট, সমুদ্রকে চেপে ধরেছে দৃঢ় আলিঙ্গনে। আগুন কেঁপে কেঁপে উঠছে, সরু কাঁটায় কালো জল ভেদ করে সেখানে কাঁপছে।

বুকের কয়েকটা বোতাম খুলে মেহ্‌রিবান সুগন্ধি গরম হাওয়া নিশ্বাস ভরে নিল।

হঠাৎ যেন বিরাট তরঙ্গ তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। জীবন, ঝোড়ো উত্তপ্ত এই জীবন, যৌবনের আনন্দ, বসন্তের অপরূপ রাতের কথা ভাবা, আর শুধু বেঁচে থাকার আনন্দ! বুক চাপা, বুক হিম করে-দেওয়া আজকের বিষণ্ণ দিনের কুয়াশাকে এক মুহূর্তে সে অনুভূতি উদ্দাম ঝড়ের মতো ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দিল। "না, যাই হোক, কাল নিশ্চয়ই কাজে যাব। ওরা রাজী না হলে শেখার, কাজটা অভ্যেস করে নেবার অনুমতি চাইব। মাহ্‌বুবাও তো বলেছে যে ওরা সবাই গোড়ার দিকে ভুল করে। সেটা বোঝা তো কঠিন নয়," ভরসা করে ভাবল মেহ্‌রিবান।

২

পরের দিন নিজের সিদ্ধান্ত মতো কারখানায় গেল মেহ্‌রিবান। মনস্থির বটে, তবু অত্যন্ত অস্থির লাগাতে পুরো এক ঘণ্টা আগে পেঁৗছল। করিডরে যেতে যেতে চোখ বুলিয়ে নিল দেয়ালের পোস্টারে, প্রাচীর পত্রিকা আর নানা বিজ্ঞাপন পড়ে দেখল। কয়েকবার পড়ল। নোটিশবোর্ডের কাছে যেতে কেন যেন তার আতঙ্ক। ওর বরখাস্তের আদেশটা কি ওখানে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে এরি মধ্যে? তখন মেহ্‌রিবান ভাবল, যদি সত্যিই আদেশটা থাকে, তার মানে ডিরেক্টরের কাছে গিয়ে চাকরিতে বহাল রাখার অনুরোধ করার দরকার নেই, তার চেয়ে ভালো নিজের কাগজপত্র নিয়ে চলে যাওয়া। জোর করে বোর্ডটার কাছে সে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল নিজের পদবী। কপালে দেখা দিল বিন্দু বিন্দু ঘাম। পাদুটো যেন অসাড়, কোনোক্রমে আরো কাছে এল। নোটিশটা পুরোনো, তাকে কাজে বহাল করার নোটিশ।

রাত্রের সিফ্‌ট্‌ শুরু হল।

মেহ্‌রিবানের সুইচবোর্ডে জামিলিয়া ব্যস্ত। সোফায় বসে দেখতে লাগল মেহ্‌রিবান মেয়েরা কেমনভাবে কাজ করে। সিমুজারের হাতদুটো সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে। সনার হাতের কথা মনে পড়ল — আগের ফ্ল্যাটে সে থাকত মেহ্‌রিবানের পাশে। একবার বাবা কি একটা ডিক্টেট করেন সনাকে আর

সনা টাইপরাইটারের দিকে একবারও না তাকিয়ে ঝড়ের মতো টাইপ করে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মেহ্‌রিবানের সাথে কথাবার্তা চালায়। সিম্‌জারও সে-রকম হতে পারে হয়ত। কিন্তু কী চুপচাপ সে। এক্‌স্‌চেঞ্জে ঢোকার পর একটিও কথা বলেনি। মেহ্‌রিবানকে নমস্কার জানায়নি, তাকায়নি পর্যন্ত তার দিকে।

"সকাল পর্যন্ত সোফায় বসে থাকতে হবে না কি?" অস্থিরভাবে ভাবল মেহ্‌রিবান। "আজকে হয়ত সিম্‌জার সুইচবোর্ডে আমাকে যেতে দেবে না?"

কয়েক মিনিট পর সিম্‌জার জামিলিয়াকে বলল:

'মেহ্‌রিবানকে জায়গা ছেড়ে দাও। তুমি ওর কাছে থাকো। বইটা ছাড়ো এখন!'

আবার মেহ্‌রিবানের চোখের সামনে জ্বলে উঠল আলো। সবচেয়ে শক্ত হল বোর্ডের কোথায় কী নম্বর, কোথায় তাদের স্থান, উপরে, নিচে, ডাইনে না বাঁয়ে সেটা স্পষ্ট মনে রাখা।

কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন অনেক কলকারখানা রাতে বন্ধ বলে টেলিফোন কল দিনের তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া, মনে হচ্ছে, চার নং ডিপার্টের ম্যানেজারটি নেই। তার গলা কানে এলে মেহ্‌রিবান হয়ত আবার দিশেহারা হয়ে যেত।

প্রায় আধ ঘণ্টা কাটল। একটাও ভুল করেনি বলে মনে হচ্ছে।

'রেখে দাও,' কাটা কাটা গলায় আদেশ দিল সিম্‌জার।

অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল মেহ্‌রিবান।

কারখানার প্রাঙ্গণে সার্চলাইট আর দুধরঙা বিজলী বাতির আলো। কেউ নেই। ক্বচিৎ কখনো সাদা ওভারঅল পরনে মেয়েরা গবেষণাগার থেকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে যাচ্ছে যন্ত্রচালনার ঘরে বা যন্ত্রচালকদের সহকারীরা যন্ত্রচালনার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখছে তেলের পাম্প। এখানে সেখানে পাইপ থেকে হিসিয়ে উঠছে বাষ্প, বাতাসে তখুনি ছড়িয়ে পড়ছে পাতলা মেঘ। বিরাট চুল্লিগুলি সমান ছন্দে বলিষ্ঠ সুরে বেজে চলেছে।

সিফ্‌ট শেষ হবার আগে বার কয়েক মেহ্‌রিবান বসেছে নিজের সুইচবোর্ডে। সবসুদ্ধ দু-তিন বারের বেশি ভুল হয়নি। একেই বলে কাজ! টেলিফোন কল কমে গেলে তার অধৈর্য অধীর লাগছে। সকালের দিকে একেবারে নিখুঁত তার হাত। বেশ মসৃণভাবে কাজ চলেছে বলে একেবারে ক্লান্ত লাগছে না, বরং মনে হল আর একটা সিফ্‌ট খাটা সহজ। সবাইকে সে দেখাতে চায় যে কাজটা পুরো রপ্ত হয়েছে।

কে একটি মেয়ে জানলা খুলে দিল। ঘরে ফেটে পড়ল পাম্পের সরব নিশ্বাস, চড়ুই'এর কিচিরমিচির। সে শব্দ যোগ দিল টেলিফোনের মেয়েদের স্পষ্ট গলার সঙ্গে।

ফরসা হয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া। সূর্য এখনো ওঠেনি। কিন্তু পেঁজা তুলোর মতো নিস্পন্দ মেঘ গোলাপী আলোর নানা রঙে দীপ্ত হয়ে উঠছে, যেন কার বিরাট তুলিতে।

চারিদিকে পাইপের জোটে ধাতুর প্যাঁচমোড়া উঁচু

তৈলাধারগুলির কালো অবয়ব পরিষ্কার আকাশের দিকে উদ্যত।

সবচেয়ে কাছের ঘাট থেকে আসছে দূর ট্যাঙ্কারের ভোঁ।

চাকার নিয়মিত ছন্দ কানে এল — ট্যাংকবাহী রেলগাড়ি সার বেঁধে চলেছে। দূরে সকালের সিফ্‌টের লোকে ভর্তি ট্র্যামের চাকার গান।

গত সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল মেহ্‌রিবানের, ট্র্যামে যখন ছোকরাটা তার পেছনে লাগে। তখন নিজেকে কত নিঃসঙ্গ আর অসহায় ঠেকেছিল।

কারখানার প্রাঙ্গণ জীবন্ত হয়ে উঠল। যন্ত্রচালকদের সহকারীরা সিফ্‌ট ছেড়ে দিল, শ্রমিকরা যে-যার ডিপার্টে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি, ছেলে বুড়ো সবাই।

টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জের জানলায় কে যেন এল বাইরে থেকে। কাজে ব্যস্ত মেহ্‌রিবান ফিরে তাকায়নি। তাছাড়া এ ঘরের বাইরে তার চেনাশুনো কেউ নেই। জানলার কাছে যারা আসে তারা সাধারণত গল্প করে ভালিদা, মাহ্‌বুবা বা লেইলার সঙ্গে। কিন্তু এবার অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার ঘটল।

'তিন নং কে?' জানলার কাছে-আসা যুবকটি জিজ্ঞেস করল।

চমকে উঠল মেহ্‌রিবান। কিন্তু ক্রমশ বেশি করে আলো জ্বলে উঠছে বলে সুইচবোর্ড নিমেষের জন্য ছাড়ার জো নেই।

সোফায় সে-সময় জিরিয়ে নিচ্ছিল মাহ্‌বুবা। চট করে উঠে মেহ্‌রিবানের কাছে এসে সংক্ষেপে বলল:

'তোমাকে চায়?'

দাঁড়িয়ে উঠে মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে গেল মেহ্‌রিবান। "কে? আমার কাছে কী দরকার?" ভাবল অস্বস্তির সঙ্গে।

কেন জানি ফিরে তাকাতে তার ভীষণ আতঙ্ক। গলাটা চেনা ঠেকছে। শেষ পর্যন্ত দম নিয়ে জানলার দিকে সে তাকাল।

জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বছর সাতাইশের দীর্ঘাকৃতি একটি যুবক। নিখুঁত সুন্দর মুখ, সরু খাড়া নাক, ঘন ঘন দাড়ি কামিয়ে গাল অল্প নীলচে। কোঁচকানো বাদামি চোখে, নিচের ঠোঁট একটু বেরিয়ে-আসা মুখের অতি মসৃণ ভাঁজে শক্তি আর আত্মবিশ্বাসের ছাপ। এক কথায় পৌরুষ আর সর্বজয়ী সৌন্দর্যের প্রতীক। সেটা সে নিজেই বিলক্ষণ জানে।

'আমি চার নং ডিপার্টের ম্যানেজার।'

যেন সাহায্যের আশায় মেহ্‌রিবান তাকাল বান্ধবীদের দিকে। কিন্তু তাদের সময় কই। টেলিফোন কলের জবাব দিতে তারা ব্যস্ত।

জানলার বাইরের মানুষটির দিকে মেহ্‌রিবান আবার ফিরল। উত্তেজনায় তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে চেষ্টা করল সাফাই গাওয়ার:

'আমি এই সেদিন...' বান্ধবীদের দেখিয়ে বলল, 'কাজে ঢুকে ওরাও ভুল করত। আর এই সিফ্‌টে, রাতের বেলায় ঠিক

কাজ করেছি। বিশ্বাস না হলে ওদের জিজ্ঞেস করুন। আমি... কাজটা আমার ভয়ানক ভালো লাগে!'

কথাটা শেষ করতে পারল না মেহ্‌রিবান। গলা ভেঙে গেছে কান্নায়। নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল।

ডিপার্টের ম্যানেজার একেবারে ভাবেনি যে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াবে। ভড়কে গেল সে। মুখে উদ্‌ভ্রান্তির স্পষ্ট ছাপ। চকচকে কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে নিল একবার। মেহ্‌রিবানের করুণ কণ্ঠস্বর, ত্রস্ত চোখ, গালে চোখের জলের চকচকে ফোঁটা, সব মিলিয়ে নবীন ইঞ্জিনিয়রের মনে অস্পষ্ট এল একটি বৃষ্টিতে ঝরা ফুলের ছবি — মেয়েটির চেহারা এত ঝরা-ঝরা।

'ব্যাপারটা বড়ো খারাপ হয়েছিল সত্যি,' অল্প একটু কেশে সে বলল। 'সেদিন নতুন যন্ত্র পরীক্ষা করা হচ্ছিল, ছেলেরা গড়বড় করে একটা, আর আমি, জানেন, সঙ্গে সঙ্গে যাকে প্রথম পেলাম তার ওপর রাগ ঝাড়লাম। আর আপনি...' আবার বিস্মিতভাবে মেহ্‌রিবানের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এক কথায় আমার মাপ চাওয়া উচিত।'

মাথা নিচু করে মেহ্‌রিবান দাঁড়িয়ে আছে। পকেট-রুমালের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছল।

সে চায় না তার কান্না বান্ধবীরা দেখে। তাই নিজেকে সামলাবার প্রাণপণ চেষ্টা।

যুবকটি উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কী বলবে

সে? ধন্যবাদ দেবে? না ধমক দেবে যে তার অসভ্য ব্যবহারে সে অনেক কষ্ট পেয়েছে? কিন্তু একটা অস্পষ্ট অনুভূতি এরি মধ্যে দেখা দিয়েছে। অনুভূতিটি গুছিয়ে বোঝার ক্ষমতা তার নেই। অনেক দিন মানুষটিকে চেনে, অনুভূতিটা অনেকটা সে-রকম। কবে দেখা হয়েছিল, কোথায়? হয়ত আগে কখনো দেখা হয়নি। হয়ত দেখা হয়েছিল — ঠিক এরি মতো কারো সঙ্গে! কিন্তু দেখেছে শুধু কল্পনায়, স্বপ্নে।

স্বপ্নে? হ্যাঁ, স্বপ্নেই... স্বপ্ন হল মানুষের আগে চলার আগ্রহ, তার সমস্ত আশা, তার গোপন কথা। মানুষকে স্বপ্ন নিয়ে যায় দূরে, ক্রমশ দূরে, কখনো পথভোলা পথিক করে। কখনো সহস্র আনন্দের প্রতিশ্রুতি দেয়, কখনো বা উদ্‌ভ্রান্তি আনে। স্বপ্নচারীর চেয়ে স্বপ্নের বয়স সর্বদা বেশি, কেননা স্বপ্ন তাকে আগামী দিনে আহ্বান করে। স্বপ্নের কোন বাধা নেই, স্বপ্নদ্রষ্টার চেয়ে বেশি শক্তি ধরে স্বপ্ন। মেয়েদের বেলায় বিশেষ করে তাদের চেয়ে তাদের স্বপ্ন সর্বদা বলিষ্ঠতর।

হয়ত তাই নতুন অস্পষ্ট উদ্দাম অনুভূতিটা বোঝা মেহ্‌রিবানের পক্ষে শক্ত। কিন্তু ব্যাপার কী না বুঝেও অন্তরের গভীরে সে এরি মধ্যে লোকটিকে ক্ষমা করেছে।

অন্তরে ক্ষমা করেছে ...

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সংযতভাবে সে বলল:

'যাক গে, ও তো পুরনো কথা।'

পাতলা মাঝারি গড়নের মেয়েটিকে ঔৎসুক্যভরে স্থির দৃষ্টিতে দেখল যুবকটি।

কুমারীর সহজাত নির্ভুল বোধে মেহ্‌রিবান বুঝল যে অনেকক্ষণ দাঁড়ানো হয়েছে, এবার জানলা থেকে সরে গেলে হয়।

'এক মিনিট,' ডেকে বলল যুবকটি। মেহ্‌রিবান দাঁড়াল বটে কিন্তু ফিরে তাকাল না। যুবকটি জিজ্ঞেস করল:

'আপনার নাম কী?'

'কেন বলুন তো?'

'আমরা তো একই কারখানায় কাজ করি, যাই হোক না। পরস্পরকে তো চিনতে হয় কখনো না কখনো।'

'সেটা আবশ্যিক নয়,' মর্যাদার সঙ্গে জবাব দিল মেহ্‌রিবান, তবু ফিরে তাড়াতাড়ি বলল:

'মেহ্‌রিবান। আমার নাম মেহ্‌রিবান।'

হেসে বলল যুবক:

'আমার নাম জাকির। জালালভ জাকির।'

মেহ্‌রিবান চুপ করে রইল।

'রাগ করেননি তো?'

কোনো কথা বলল না মেহ্‌রিবান। নিজের জায়গায় ফিরে যেতে চায় সে, কিন্তু কার বলিষ্ঠ হাত যেন তাকে জানলার কাছে ধরে রেখেছে।

'চুপ করে আছেন কেন? আমাকে কিছুই বলবেন না?'

মেহ্‌রিবান অনুভব করল তার দিকে কে-যেন চেয়ে আছে। ফিরে তাকাতে চোখোচোখি হল সিমুজারের সঙ্গে। কঠোর সে চোখ। তাই কোনো উত্তর না দিয়ে জানলা থেকে চলে এল সে।

ঘরে হৈ হৈ করে ঢুকল সকালের সিফ্‌টের মেয়েরা।

'নমস্কার, নিশাচররা! কেটে পড়ুন এবার। নিজেদের জিভ কানকে জিরোতে দিন!'

'খালি বকবক!' জায়গা ছেড়ে উঠে কথাটা ছুঁড়ে মারল সিমুজার। সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ। স্কার্ফ আর ব্যাগ নিয়ে বান্ধবীদের সঙ্গে বেরোল মেহ্‌রিবান।

রাস্তায় এসে ভালিদা আর মাহ্‌বুবা দু দিক থেকে ওর হাত ধরল, একসঙ্গে সবাই চলল ট্র্যামস্টপের দিকে।

রাস্তায় আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না ভালিদা:

'ও তোমাকে কী বলল?'

'কে?'

'খুরে পেন্নাম তোমার,' বাচ্চাদের মতো ভেংচে বলল ভালিদা। 'কমরেড জালালভ, চার নং ডিপার্টের ম্যানেজার! তিনি তোমার উপর তম্বি করেছিলেন সেদিন!'

কী যেন ভেবে হাসল মেহ্‌রিবান।

'কী যে বললেন, ঠিক বুঝিনি... মাপ চাইছিলেন মনে হল।'

'ব্যস, আর কিছু নয়?' সেয়ানাভাবে চোখ তুলে বলল ভালিদা।

'হ্যাঁ।'

মেহ্‌রিবানের দিকে না তাকিয়ে মাহ্‌বুবা মন্তব্য করল:

'ছেঁদো কথা!'

মেহ্‌রিবান থেমে শিশুদের মতো বিস্ফারিত বিষণ্ণ চোখে ওদের দিকে তাকাল:

'ছেঁদো কেন?'

'মাপ চাইতে এতক্ষণ লাগে না!' ব্যাখ্যা করল মাহ্‌বুবা।

মেহ্‌রিবানের মনে হল বলে, এ ব্যাপারে ওদের নাক গলাবার কী দরকার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বকল সে, "ও-রকম বলা উচিত নয়। এরা বেশ লোক, আমার সঙ্গে কী সুন্দর এদের ব্যবহার..."

জাকিরের সঙ্গে আলাপটা সঠিক মনে করার চেষ্টা করল সে।

'প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম। বললাম এ সিফ্‌টে বেশ ভালো কাজ করেছি। ও বলল যে তার কাজে কী একটা গড়বড় ঘটে। মাপ চাইল...'

'ব্যস, এই সব?' অধৈর্যভাবে প্রশ্ন করল ভালিদা।

'না। পরে আমার নাম জিজ্ঞেস করল। বললাম। নিজের নামও বলল। ব্যস, আর কী।'

সবজান্তার মতো মুখ চাওয়া চাউয়ি ক'রে ভালিদা ও মাহ্‌বুবা সহজ কথোপকথনের ভেতরকার রহস্যটা ধরার চেষ্টা করল। মিনিটখানেক ভাবল দুজনে।

'মানে তুমি প্রথমে ঘাবড়েছিলে,' মাহ্‌বুবা শুরু করল, 'আর ও নিজের অভব্যতার উপর জোর দিয়ে মাপ চাইল? এতে আমার মতে কিছু তো নেই! অভব্যতা করে লোকে ক্ষমা চেয়েছে। তারপর, দু নম্বর কথা: তোমার নাম জিজ্ঞেস করল, তুমি বললে। এতেও তো অসাধারণ কিছু দেখছি না। তোমার কী মনে হয়, ভালিদা?'

মুখ বেঁকিয়ে ভালিদা বলল:

'আমারো তাই মনে হচ্ছে।'

মাহ্‌বুবা ভারিক্কিভাবে মেহ্‌রিবানের দিকে চেয়ে বলল:

'তবে বলি। আমরা সবাই একসাথে কাজ করি, আর আমাদের রেওয়াজ হল এই: সকলের জন্য একজন, একজনের জন্য সকলে। তোমার যা-যা হবে সব আমাদের বলবে। কিছু চেপে যেও না। শুনছ?'

কৃতজ্ঞভাবে মাথা নাড়াল মেহ্‌রিবান।

'আচ্ছা!'

মেহ্‌রিবানের হাত ছেড়ে দিয়ে মাহ্‌বুবা বলল:

'আমরা ভালিদার ওখানে যাচ্ছি এবার। ওর পোষাক সেলাই করব। আমি আবার দরজির মতো কিনা। তোমার কিছু দরকার পড়লে লজ্জা করো না, বোলো। আসি তাহলে।'

এরিমধ্যে এগিয়ে গিয়েছে ভালিদা, দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল:

'কাল সকালের সিফ্‌ট। আসি।'

কারখানা বসতির দিকে দুজনে চলে গেল।

দৌড়িয়ে গিয়ে মেহ্‌রিবান চলন্ত ট্র্যামে লাফিয়ে উঠল। মাথা ঘুরছে, রাতে ঘুম হয়নি সেজন্য হয়ত, হয়ত কাজ করে ক্লান্ত বলে। কারখানার বিরাট সব দালান, পাইপ, রেলে মসৃণভাবে চলন্ত ক্রেন, এদিক-ওদিক চলা নিজেদের বাষ্পে প্রায় রুদ্ধশ্বাস ইঞ্জিনগুলি, আর দূরে বাড়িঘর দোকান — সবকিছু ঝাপসা লাগছে চোখে। সত্যি কি অসাধারণ কিছুই ঘটেনি? না, তা কী করে হয়, ঘটেছে বইকি! ঘটেছে নির্ঘাৎ। প্রথমত, রাত্তিরে কাজ করেছে সফলভাবে, তারপর ডিপার্টের ম্যানেজার ক্ষমা চেয়েছে। অর্থাৎ লোকটা আর চেঁচাবে না, নালিশ করবে না ডিরেক্টরের অফিসে।

এত সুখী আর কখনো লাগেনি মেহ্‌রিবানের। পিঠ থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেছে যেন। এর সঙ্গে কী একটা উত্তেজনা আর অস্থিরতা ঢুকেছে অন্তরে। অস্পষ্টভাবে মনে হল জানলার ধারে সংক্ষিপ্ত আলাপে শুরু হয়েছে নতুন একটি সম্পর্ক তার আর সেই লোকটির মধ্যে, নাম যার জাকির, যার মুখটা এত ভয়ংকর চেনা। সেই অমসৃণ ভুরু, সেই স্বল্প কুঞ্চিত বাদামি চোখের স্থির দৃষ্টি, যা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তার এত ভালো আর উষ্ণ লাগে, এ যেন তার আপন জন, একেবারে আপন জন! সেই জন্যই তো চট করে তাকে নিজের নাম বলেছে। মেহ্‌রিবান অনুভব করল এই দেখা শেষ নয়।

ভুল করেনি মেহ্‌রিবান। সে-সময় ডিপার্টে জাকির এদিক-

ওদিক ঘুরে ব্যবস্থাপনা আর কাজ যাচিয়ে নিতে নিতে ভাবছিল তার কথা।

কেন জানি শৈশবের একটা ঘটনা মনে পড়ল তার।

তখন তার বয়স ছ বছর। আঙিনায় দুচাকার হাতগাড়িটা চালাচ্ছে, হঠাৎ ছাদ থেকে একটা চড়ুইছানা পড়ে গেল। তখনো উড়তে শেখেনি, লুকোবার একটা জায়গার খোঁজে অসহায়ভাবে দেয়ালের কাছে লাফাতে লাফাতে কিচিরমিচির করতে লাগল করুণ সুরে। হাতগাড়ি ফেলে দিয়ে জাকির গেল তাকে ধরতে। হঠাৎ কানে এল মা-চড়ুই'এর অস্থির জোর চেঁচানি। বাচ্চার উপরে উড়তে উড়তে তাকে ডেকে এত হৈচৈ সে লাগাল যে আঙিনার সমস্ত চড়ুই এসে হাজির; তারাও লাফাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, কী করে সাহায্য করবে জানা নেই। দুষ্টু জাকির তাদের দিকে দৃকপাত না করে চড়ুইছানাটাকে ধরল। জীবনে এই প্রথম হাতে জীবন্ত পাখি। উষ্ণ গা, নরম পালক, হলদে নাকটা মজার দেখতে। যত হাতে কামড়াচ্ছে, ছাড়াবার চেষ্টা করছে, জাকির তত জোরে তাকে চেপে ধরছে, শুনছে পাখিটার বুকের ধুকপুকানি। পাখির ছানাটাকে হাতে নিয়েই এক ছুটে সে বাড়ি ফিরল। সারা দিন জানলার ধারে মা-চড়ুই'এর হতাশ ডাক। জাকিরের ইচ্ছে পাখিটাকে রেখে বড়ো করা। যাতে না পালায় সেজন্য ছাঁকনিতে ঢেকে রাখল, রুটির গুঁড়ো ছড়িয়ে দিল। তারপর খাঁচা তৈরির পালা। কাঠি সরু আর সমান করে পাশাপাশি বসানো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খাঁচা তৈরি, নড়বড়ে

বোকা খাঁচা, তা হোক গে। চড়ুইছানাকে খাঁচায় পুরল জাকির। সন্ধ্যার দিকে মারা গেল পাখিটা।

অনেক দিন আগেকার কথাটা কেন যে আজ মনে পড়ল, বুঝতে পারল না জাকির। হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে সে ভাবল, "ওর সঙ্গে আর একবার দেখা করতেই হবে, উচিত মতো মাপ চেয়ে শান্ত করা চাই। ওকে বেজায় ভয় পাইয়ে দিয়েছি দেখছি।"

৩

মেহ্‌রিবানের সম্বল মাত্র সাত রুবল। দশ-বারো দিনের আগে মাইনের প্রথম টাকাটা পাবে না। তাছাড়া নিসাবেইম'এর কাছে দু'শ রুবল ধার, যত শীগগির শোধ করা যায় তত ভালো। ঘরে এখনো কিছু মাকারনি আর মাখন পড়ে আছে। এ কদিন তো তাই খেয়ে চালিয়েছে মেহ্‌রিবান। মাকারনির সঙ্গে ভাজা পেঁয়াজ আর কিছু সব্জি থাকলে আরো মুখরোচক হত অবশ্য। কিন্তু যা পায় তাই খেয়ে চালানো মেহ্‌রিবানের অভ্যেস হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে নিসাবেইম দরজায় টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করে তার কিছু চাই কিনা। তাড়াতাড়ি মেহ্‌রিবান বলে, 'না, না, ধন্যবাদ, আমার সব আছে।'

একবার তার কথায় খটকা লাগাতে নিসাবেইম শুধাল,

'বাছা, আমার তো মনে হয় তোমার টাকা অনেক দিন খতম। কী করে চালাচ্ছ শুনি?'

'বাবা টাকা পাঠিয়েছেন, নিসা-খালা,' বলল মেহ্‌রিবান। তীক্ষ্নবুদ্ধি বুড়ীর মুখে সন্দেহের ছাপ দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'এবারে অল্প টাকা পাঠান, তাই তোমার টাকাটা ফেরৎ দিতে পারিনি। কিছু মনে কোরো না খালা। পরের বার নিশ্চয়ই দেব।'

চটে উঠে উরতে করাঘাত করল নিসাবেইম:

'শোনো দেখি! ছুঁড়ীর কথাটা শোনো! আল্লা তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, তোমার কাছে টাকা চেয়েছি কখনো?'

মৃদুকণ্ঠে বলল মেহ্‌রিবান:

'ঠাকুমা হামেশা বলতেন, "লক্ষ লক্ষ টাকা দান করতে পারিস কিন্তু এক পয়সাও ধার করলে ফেরৎ দিবি!"'

'তাঁর কবর আল্লা আলো করে রাখুন। কত না ধার নিয়েছি তাঁর কাছে!'

মেহ্‌রিবান জানত যে নিসাবেইমের তিন ছেলে আর এক মেয়ে। প্রত্যেকেই বেশ কৃতী বিশেষজ্ঞ, সচ্ছল অবস্থা, নিসাবেইম এমন কোনো অভাবে পড়তে পারে না যে ঠাকুমার কাছে ধার নিতে হবে। নিসাবেইম মানুষটি ভালো সে জানে। সর্বদা তাকে সাহায্য করতে রাজী, তবু ঋণটা যত শীগগির পারে ফিরিয়ে দেবে সে ঠিক করেছে।

রাতের সিফ্‌টের পর ক্লান্ত লাগছে, তবু বাড়ি ফিরেই

মেহ্‌রিবান ঠাকুমার সিন্দুক খুলল। পুরোনো পোষাক-আষাক, শাল। ঠাকুমার জিনিস হাতছাড়া করা মেহ্‌রিবানের পক্ষে দুঃসহ। সিন্দুক বন্ধ করে ঘরের চারদিক সে দেখতে লাগল, কী বেচা যায়।

ঠাকুমা বেঁচে থাকতেই বাসন রাখার বাদাম কাঠের আলমারিটা বেচা হয়। যেখানে জিনিসটা ছিল সেখানে দেয়াল-কাগজের সমকোণ অংশটা অন্য অংশের চেয়ে পরিষ্কার, এখনো সেটা নজরে পড়ে।

ঘরে পুরনো একটা খাট, লেখার টেবিল, দেরাজ-আলমারি আর সাধারণ একটা আলমারি।

অন্য ঘরটা বেজায় ছোট্ট। ভাঙা স্প্রিঙের একটা পুরোনো অটোমান। মেঝেতে পোকায় খাওয়া ফুটো একটা কম্বল।

আর কী? জানলার তাকে সামোভারটার ওপর চোখ পড়ল মেহ্‌রিবানের। অনেক দিন জল ফোটেনি ওটাতে। আগে জিনিসটা ছিল বড়ো ঘরে, দেরাজ-আলমারির ওপর, শোভার জন্য। মলিন হয়ে যাওয়াতে এখানে রাখা হয়।

মেহ্‌রিবান ঠিক করল সামোভারটা বেচে দেবে। পুরোনো জিনিসের বাজারে এ-রকম জিনিস বেচা সহজ। কিন্তু সামোভার হাতে খরিদ্দারের আশায় ভিড়ের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে, ভেবেই লজ্জা হল। মনে পড়ল যে রোজ সকালে বাড়ির উঠোনে একটা কারবারি চেঁচায়: "পুরোনো মাল চাই! পুরোনো মাল!"

মেহ্‌রিবান অপেক্ষা করে রইল। শেষ পর্যন্ত উঠোনে শোনা

গেল সেই নাকিসুর গলা: "পুরোনো মাল চাই! পুরোনো মাল!" অন্যের অলক্ষিতে জানলা খুলে ইশারায় কারবারিকে ডাকল মেহ্‌রিবান।

মিনিটখানেক বাদে দরজায় জোর টোকা। ঘরে ঢুকল দারুণ লম্বা বুড়োটে একটা লোক, কাঁধে থলি। গায়ে জুতোর কালি আর পুরনো কানির টকটক গন্ধ। মুখটা ঠিক ঝুলির মতোই জীর্ণ আর ধুলোভরা। লোভী দৃষ্টিতে ঘরটা দেখে নিল সে।

তার তাকাবার ধরনে ভয় পেল মেহ্‌রিবান।

'কি, যা আছে দেখাও!' ভাঙা গলায় বলল লোকটা, মুখে একটা উদাসীন অবহেলার ভাব এনে।

হাতলদুটো ধরে সামোভারটা নামিয়ে তার পায়ের কাছে রাখল মেহ্‌রিবান। কাঁধ থেকে ঝুলি নামিয়ে হালকাভাবে সামোভারটা তুলে দেখল সে, মুখে এমন একটা অবজ্ঞার ভাব এল যে মেহ্‌রিবানের তখুনি সন্দেহ হল জিনিসটা বিকোবে কিনা।

মেঝেতে সামোভার নামিয়ে রেখে কারবারি থলিটা কাঁধে তুলে বলল:

'এই বাজে মালটার জন্য আমাকে তিন তলার সিঁড়ি ভাঙতে হল!'

'কেন, দাদু?' ভীরু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেহ্‌রিবান। 'জিনিসটা ফুটো নয়, ভাঙা নয়, দেখ, টোল পর্যন্ত খায়নি। জল ঢেলে দেখ।'

উটের মতো নিচের ঝোলা ঠোঁটটা আরো ঝুলিয়ে মাথা নেড়ে লোকটা বলল:

'জিনিসটা কোনো কাজে লাগলে ঝেড়ে দিতে চাইবে কেন?'

লজ্জিতভাবে মৃদু কণ্ঠে মেহ্‌রিবান জানাল:

'আমার কিছু টাকা দরকার।'

'টাকা দরকার — তাহলে বেচার মতো জিনিস বেচো।'

'বেচার মতো আর কিছু নেই।'

অনুমতির বালাই না রেখে কারবারি ঘুরে ঘুরে পাকা চোখে জিনিসপত্তর দেখতে লাগল।

ভয়ে মেহ্‌রিবান কাঠ হয়ে গিয়েছে। গৃহকর্ত্রীর পরোয়া না করে বেঁকা আঙুলে লোকটা দেরাজ-আলমারিতে যেমন-তেমন করে টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'বাক্সে কিছু আছে নাকি? সিল্কের রুমাল বা শাল?'

'এটা ছাড়া আর কিছু বেচব না,' মেহ্‌রিবান সামোভারটা দেখাল।

'আলমারিতে কী আছে?'

'বাসনকোষণ।'

'তামার ডেকচি আছে?'

'হ্যাঁ ...'

'দেখি একবার।'

দেয়াল-আলমারিটা খুলল মেহ্‌রিবান। নিচের তাকে ঝকঝকে বেশ বড়ো একটা তামার ডেকচি।

মাথা নেড়ে কারবারি যেন অনুগ্রহ করছে এমনভাবে বলল, 'বেশ, বেশ। সামোভারের কাছে রাখো ওটাকে।'

মেহ্‌রিবান নড়ল না।

'আমি পারব না। আমার শক্তিতে কুলোবে না।'

'ও-রে বা-বা,' টেনে টেনে ব্যঙ্গের সুরে বলল রোগা লম্বা লোকটা। আলমারি থেকে ডেকচিটা নামিয়ে দরজার কাছে আনল। তারপর জিজ্ঞেস করল:

'আর কিছু দেখাও দেখি। এর জন্য কিছু তো মিলবে না।'

চুপ করে রইল মেহ্‌রিবান।

'রুপোর চামচে বা সুপের বাটি গোছের কিছু!' লোকটা নাছোড়বান্দা।

'আমাদের ছটা চামচে ছিল। একটা হারিয়ে গেছে।'

'কোই পরোয়া নেই। বাকিগুলো দেখি।'

'ওগুলো বেচতে চাই না।'

হেঁড়ে গলায় খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল লোকটা:

'টাকা চাই, এদিকে বেচবার মতো জিনিস বেচবে না! এভাবে কেনাবেচা চলে না বাছা! সাদামাটা চামচে করে খেলে চায়ের খুশবু বুঝি থাকে না?'

গত্যন্তর নেই। চামচেগুলো নিয়ে এল মেহ্‌রিবান। যেন ওগুলোর দাম কিছু নেই এমনভাবে লোকটা ডেকচির ওপর ফেলাতে করুণ টুংটাং শব্দ করে উঠল সেগুলো।

'চটিফটি কাপড়চোপড় কিছু আছে?' কারবারি প্রশ্ন করল।

'আর কিছু নেই।'

'জিনিস বেচে তো অন্ন জোটে, সোজা কথাটা বলো না বাপু!'

এ অপমান সইতে পারল না মেহ্‌রিবান। দৃঢ় কণ্ঠে বলল:

'তুমি যাও! তোমাকে কিছুই বেচব না।'

'এভাবে চলে না বাপু!' গলাটা অনেকখানি নরম করে বলল কারবারি। 'পুরো একটা ঘণ্টা আমার লোকসান করেছ,এ সময় কত বেচাকেনা করতে পারতাম। ভেবে দেখ। কথাটা এমনিতে বলেছিলাম। আমি তোমার বাবার বয়সী।'

'আচ্ছা, কিন্তু তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি!'

সামোভার, ডেকচি আর চামচেগুলো আর একবার দেখে নিয়ে কারবারি মেহ্‌রিবানের দিকে ফিরে বলল:

'হাতে হাত মেলাও!'

'কেন?'

'কারবারে তাই নিয়ম, বাছা, দেখি হাতটা!'

বিব্রত হয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল মেহ্‌রিবান। শিরতোলা থাবায় মেহ্‌রিবানের হাতের ছোট্ট চেটোয় টোকা দিয়ে লোকটা দরাদরি আরম্ভ করল:

'সত্তর রুবল!'

জিনিসগুলোর দাম বিষয়ে এতটুকু জানত না মেহ্‌রিবান, তবু মনে হল বুড়ো ঠকাচ্ছে। হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে।

'এ সবকিছুর জন্য সত্তর?'

বুড়োর ভুরু কুঁচকে উঠল:

'কী আছে এখানে? টিনের জিনিস!'

'না, দাদু, এ অত্যন্ত কম।'

'হাতটা দাও দেখি!'

আবার হাত বাড়াল মেহ্‌রিবান।

'পঁচাত্তর রুবল, আল্লার মেহেরবানি!' আবার তার হাতে ঘা দিয়ে বলে উঠল কারবারি। বুড়োর ঘা'এর চোটে নীলচে হাত আবার ছাড়িয়ে নিল মেহ্‌রিবান।

'ওতে হবে না। আমার আরো টাকা দরকার।'

'সে কি! কত চাও তোমার মুখেই শুনি।'

মাইনে না পাওয়া পর্যন্ত চালাতে হবে মেহ্‌রিবানকে, তাছাড়া নিসাবেইমের ধার। মনে মনে হিসেব করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল:

'তিনশ রুবল।'

খোঁচা খোঁচা ময়লা ভুরু তুলে বুড়ো বেরিয়ে গেল কিছু না বলে।

ভারি একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করল মেহ্‌রিবান, নাসারন্ধ্র অল্প কেঁপে উঠল। বুড়োর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করার কোনো তাড়া নেই। কিন্তু ফিরল না লোকটা। দরজাটা ভেজিয়ে মেহ্‌রিবান ভাবছে সামোভারটা যথাস্থানে রেখে দেবে, এমন সময় দরজায় আবার টোকা। সেই বুড়ো। পকেটে হাত রেখে বলল:

'শেষ কথা — একশ রুবল!'

লোকটা ফিরে আসাতে মেহ্‌রিবানের সাহস বেড়েছে। চোখ নামিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল:

'তিনশ!'

'বাছা, তোমার ইনসান তো আছে! তুমি আমার সবকিছু কেড়েকুড়ে নিতে চাও?'

'না, দাদু! তোমার সুবিধে না হলে নিও না।'

'হাতটা দেখি!'

'হাতে হাত না মেলালেও চলবে।'

'একশ পঁচিশ রুবল!'

'আমার তিনশ দরকার!'

'ইনসানটা কি শিকেয় তুলে রেখেছ?'

'তুমি না চাইলে অন্য কাউকে বেচব!'

ব্যঙ্গভরে হাসল বুড়ো।

'আর কেউ এ বাড়িতে পা দিতে পারবে না! সারা সহরটা কারবারিরা ভাগ করে নিয়েছে। এটা আমার এলাকা, এ আঙিনা আমার।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেহ্‌রিবান।

'তা জানি না। আমার তিনশ রুবল দরকার।'

'তাই যদি দরকার তাহলে এর সঙ্গে আরো কিছু বেচ।'

'আর কিছু বেচব না।'

'বেশ, তাহলে চলি।' রেগে গজগজ করতে করতে বুড়ো

চলে গেল। কিন্তু মিনিট তিনেক যেতে না যেতে বুড়ো আবার দেখা দিল।

'দেখি হাতটা!'

'কেন মিছিমিছি।'

'দু'শ!'

'আমার তিনশ দরকার।'

'দেখো বাছা, শাহেনশাকে এতক্ষণ ধরে হয়রান করলে তিনি হয়ত মেয়েকে দিয়ে দিতেন। এর জন্য তিনশ চাও, কিন্তু তিনশ'র মতো দাম তো হওয়া উচিত। হাজার টাকা দরকার হলেও তুমি কি সমানে হাজার চাইতে?'

'জিনিসগুলোর দাম আরো বেশি,' মেহ্‌রিবান নাছোড়বান্দা। 'নইলে তুমি অনেক আগেই চলে যেতে।'

শেষ পর্যন্ত বুড়ো মনস্থির করে বলল, 'দেখি হাতটা।' নিজেই মেহ্‌রিবানের হাতটা টেনে নিয়ে টোকা দিয়ে ঘোষণা করল:

'আড়াই শ!'

আরো দরাদরি করতে লজ্জা হল মেহ্‌রিবানের। এরিমধ্যে কয়েকবার সে অস্থির বোধ করেছে।

'আচ্ছা, তাই হোক!'

বুড়ো পকেট থেকে ব্যাগ বের করে কানির মতো নিখুঁত ভাঁজ করা নোট আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে গুণে দেখে এগিয়ে

দিল মেহ্‌রিবানকে। কুয়োর মতো গভীর তার থলিতে নিমেষে তলিয়ে গেল সামোভার, ডেকচি আর চামচেগুলো।

'শুধু ভার বইবার জন্য আড়াই শ রুবল গচ্চা দিতে হল!' গজগজ করতে করতে চলে গেল বুড়ো।

আসলে শুধু চামচেগুলোরই দাম আড়াই শ, সামোভার আর ডেকচি তো ফাউ। এটা তার বিলক্ষণ জানা। দাঁওতে বেশ খুশি সে।

মেহ্‌রিবানও বেশ খুশি। অত টাকা পাবে কখনো ভাবেনি। বুড়ো চলে যাবার পরই সে নিসাবেইমের দরজায় টোকা দিয়ে আনন্দে জ্বলজ্বল মুখে তাকে টাকাটা এগিয়ে দিল।

'বাবা আবার টাকা পাঠিয়েছেন, নিসা-খালা। এই নেও... অনেক ধন্যবাদ!'

নিসাবেইমের অনেক আপত্তি সত্ত্বেও মেহ্‌রিবান তার হাতে ভাঁজ-পড়া নোটগুলো গুঁজে নিজের ঘরে পালাল।

কারবারির প্রকাণ্ড বুটের ছাপ পড়েছে মেঝেতে। সাবধানে সেগুলো মুছে অনেকক্ষণ ধরে হাত ধুল মেহ্‌রিবান।

জলখাবার খেয়ে শুল সোফায় কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুম এল না। মাথায় নানা চিন্তার ভিড়, স্থির কী করে হবে। "তাহলে ধারটা শোধ হল। হাতে এখনো সাতান্ন টাকা। মাইনে না পাওয়া পর্যন্ত চালাতে হবে। চালাব ঠিক। ভালিদা আর মাহ্‌বুবা কী চমৎকার মেয়ে! সবায়ের জন্য একজন, একজনের জন্য সবাই... তার মানে, এক সাথে কাজ করতে পারব। 'আপনার নাম কী?'

'আমার নামে আপনার কী দরকার? মেহ্‌রিবান। আমার নাম মেহ্‌রিবান।' নামটা এত তাড়াহুড়ো করে বললাম কেন? 'আর আমার নাম জাকির।' ওর নাম তাহলে জাকির। জাকির... খাসা নাম! মাহ্‌বুবা তো হামেশা ওর খানবালার সঙ্গে ঝগড়া করে। কেন? ইবাদ নিজের গাড়িতে ভালিদাকে নিয়ে যাবে। লেইলা মেয়ে চায়, ওর স্বামী চায় ছেলে। আমি চাকরি পেয়েছি শুনলে বাবা হয়ত খুশি হবেন। কে জানে, হয়ত হবেন না। হয়ত তাঁর কাছে সবই সমান। আমাকে একেবারে ভুলে গিয়েছেন বাবা। চিঠিপত্র আর লেখেন না... একা একা কী করে বেঁচে থাকব?.. পৃথিবীতে কত লোক, কত রকমের লোক। আমার চেনাশোনা সব মেয়েদের বাপ মা আছেন, হয় বাপ নয় মা। আর আমি একা। একা! একা হওয়াটা বিচ্ছিরি, ভারি বিচ্ছিরি। কারবারিটা কী বিশ্রী লোক... জাকির কাল আসবে না কি? কেন আসবে? আমার কাছে আসার কী দরকার ওর?"

উত্তেজনা আর অবসাদের জের চলেছে। চোখের পাতা বন্ধ হল ধীরে ধীরে। মেহ্‌রিবানের মনে হল যেন সমুদ্রের তলে সে নামছে, দেহটা ভারহীন, নিশ্বাস পড়ছে না বলতে গেলে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, তার চিন্তাধারার মতোই ভারি আর খাপছাড়া একটা স্বপ্ন।

...আপনা থেকে দরজাটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল কারবারি, পিঠে বিরাট একটা থলি। লোভী দৃষ্টিতে চাইল মেহ্‌রিবানের দিকে, সে ভয়ে আঁতকে সরে গেল কোণে। ঘরের সমস্ত জিনিস

হাতিয়ে লোকটা পুরল থলিতে। থলির অতল গহ্বরে চলে গেল থালাবাসন, খাট, জামাকাপড়, এমন কি আলমারি আর লেখার টেবিলটা পর্যন্ত — ঘরের সবকিছু। তারপর লোকটা কাছে এসে পালকের মতো মেহ্‌রিবানকে ধরে থলির দিকে নিয়ে গেল। থলির হাঁ-করা গহ্বরের দিকে দিশাহারা আতঙ্কে তাকিয়ে মেহ্‌রিবান তার হাতে কামড়াতে লাগল, চেষ্টা করল নিজেকে ছাড়াবার। ইচ্ছে হল চীৎকার করে, কিন্তু গলায় শব্দ এল না। সংজ্ঞা হারাল সে। হঠাৎ কার শক্ত হাত তাকে ছিনিয়ে নিল কারবারির থাবা থেকে। জাকির! ভয়ে মৃতপ্রায় অবসন্ন মেহ্‌রিবান ত্রাণকর্তার গলা দু হাতে আঁকড়ে ধরে ছোট মেয়ের মতো কাঁদতে লাগল। থলি কাঁধে কারবারি পালিয়েছে। মেহ্‌রিবানের কানে ফিসফিসিয়ে রহস্যভরে জাকির বলল, 'আমাকে যেতেই হবে।' আতঙ্কে তাকে আরো জাপটে ধরল মেহ্‌রিবান।

'না, না, যেও না! আমার ভয় করছে, তুমি যেও না। ভয়ানক ভয় করছে! যেও না!'

ফাঁকা ঘরে চোখ বুলিয়ে জাকির শুধাল, 'তোমার বাপ-মা কই?'

'আমার কেউ নেই — আমি একা। একা...'

হাত ছাড়িয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেও পারল না জাকির। জলভরা চোখে মেহ্‌রিবান কাকুতিমিনতি করল তাকে যেন একলা রেখে না যায়। জাকির জিজ্ঞেস করল:

'তোমার ভয় কীসে?'

'লোকজনে আমার ভয়। ওরা খারাপ, ওদের দয়ামায়া নেই। ওদের বুক পাথরের মতো। বাবা আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন, সৎমা আমাকে দেখতে পারেন না, ঠাকুমা মারা গেছেন, কারবারিটা আমার সবকিছু কেড়েকুড়ে নিয়েছে। দোহাই তোমার জাকির, তুমি থাকো, আমার সঙ্গে থাকো! আমার ভয়ানক ভয় করছে যে, আমি একা।'

তখন জাকির তাকে বুকে চেপে তার অশ্রুসিক্ত ঠোঁটে চুমু খেল, বারবার চুমু খেল... আবার তার ভয় জাগল, কিন্তু অন্য ধরনের ভয়। এবার ত্রাণকর্তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা তার...

...হাঁপাতে হাঁপাতে সোফা থেকে লাফিয়ে নেমে ভয়ার্ত চোখে এদিক-ওদিক চাইল মেহ্‌রিবান। স্বপ্ন শুধু! ঘরের সবকিছু আগেকার মতো রয়েছে। তার মানে, কারবারি জিনিসপত্রগুলো লোটেনি, জাকির আসেনি এখানে! স্বস্তিতে হাঁফ ছাড়ল মেহ্‌রিবান।

জানলার বাইরে ছড়িয়ে-পড়া সহর সূর্যাস্তের আলোয় গোলাপি হয়ে উঠেছে, যেন দিনের অসহ্য তাপ মুক্ত হয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে। রাস্তায় ছেলেমেয়েরা খেলছে, তাদের কণ্ঠস্বর অতল স্বচ্ছ আকাশে বিনা বাধায় পেঁছচ্ছে।

না, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেনি। তবু বিস্রস্ত বসনে, উদ্‌ভ্রান্তভাবে উঠে ঘরের মাঝখানে যখন সে দাঁড়াল তখনো গালদুটো এত গরম কেন? কেন নিজের কাছেই সরম লাগছে?

তাকে চুমো খেয়েছে জাকির! জীবনের প্রথম চুম্বন তাহলে

স্বপ্নে ঘটল! কিন্তু তবু স্বপ্নটা এত স্পষ্ট, এত প্রখর যে অনেকক্ষণ মেহ্‌রিবান স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে সীমারেখা টানতে পারল না।

"কেন ওকে অমন করে ধরে রেখেছিলাম, কেন?" অনুশোচনার সঙ্গে সে ভাবল।

কেন জানি না তার অন্তরে জাকিরের প্রতি একটা অবিশ্বাস জেগে উঠল।

৪

পরের দিন মেহ্‌রিবানের কাজ আরো ভালো হল। অবশ্য তখনো সুইচবোর্ডে না তাকিয়ে নম্বর বের করতে শেখেনি অন্য মেয়েদের মতো। তখনো তার বিস্ফারিত চোখ আগেকার মতো একাগ্রভাবে সারা সুইচবোর্ডে ঘুরে আসে। যা হোক, সেদিন কেউ তার নামে নালিশ করেনি।

সাত-সকালে কাজে এসেছে বলে সকালের খাওয়াটা হয়নি। খাবার কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিয়েছে। জামিলিয়া তার জায়গায় আসার পর মেহ্‌রিবান খোলা জানলার পাশে সোফাটায় বসে খাবারের মোড়কটা খুলল।

রুটিটা দুদিনের পুরনো, শক্ত। গুঁড়োগুলো ঝরে পড়ছে পোষাকে। খাওয়া সেরে মেহ্‌রিবান গুঁড়োগুলো সাবধানে কুড়িয়ে জানলার তাকের বাইরে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক চড়ুই উড়ে এসে খেতে শুরু করল কিচির মিচির করে।

ধূসর পাখিগুলির চেঁচামেচিতে মেহ্‌রিবানের কাজের ব্যাঘাত ঘটছে কিন্তু ওদের তাড়িয়ে দিতে মায়া হল।

হঠাৎ চড়ুইগুলো একসঙ্গে পাখা ঝাপটে উড়ে গেল। কেউ ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

ফিরে তাকাল না মেহ্‌রিবান, কিন্তু বুকটা হঠাৎ আশায় ধকধক করে উঠল, কেঁপে উঠল আঙুলের ডগা, শিরা উপশিরা; অন্তর জানাল যে জাকির এসেছে।

'মেহ্‌রিবান!'

ঘুরে তাকাল না মেহ্‌রিবান। যেন কিছু শোনেনি সে। মেয়েদের সামনে অস্বস্তি লাগছে। আবার এসেছে কেন? আগের বার এসেছিল ক্ষমা চাইতে, বেশ তো। কিন্তু এখন?

'নমস্কার, মেহ্‌রিবান!'

ভুরু ভয়ানক কুঁচকে বই নামিয়ে জামিলিয়া জানলায় তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে উঠে মেহ্‌রিবানের জায়গায় বসল।

দোষী বাচ্চার মতো মেহ্‌রিবান সলজ্জভাবে আড়চোখে সিমুজার এবং অন্যদের দিকে তাকিয়ে, স্কার্ফের কোণ মুড়তে মুড়তে জানলার দিকে গেল।

কুর্তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেশ সপ্রতিভভাবে দাঁড়িয়ে আছে জাকির। মাড় দেওয়া শক্ত ধবধবে সাদা কলার বলিষ্ঠ গলা ঘিরে আছে স্বচ্ছন্দে। কলারটা আর মাঝখানের সঠিক ছোট্ট নট বাঁধা ছোপ-ছোপ কালো টাইটা সুন্দর মানিয়েছে তাকে, ফরসা রঙ আরো ফুটে উঠেছে।

'নমস্কার, মেহ্‌রিবান!'

'নমস্কার,' বলল মেহ্‌রিবান। নিজের গলাটা মনে হল অন্য কারোর। 'শুভ কাজে এসেছেন তো?'

'শুভ কাজে নিশ্চয়ই,' হেসে বলল জাকির।

প্রথম দেখাতেই মেয়েটির ভীত বিষণ্ণ চোখ তার মর্মস্পর্শ করেছে, তবু সেটা কিছুতে যেন প্রকাশ না পায় সেই তার প্রয়াস। ব্যবহারটা অনায়াস এবং স্বচ্ছন্দ রাখতে সে চায়। তার নড়াচড়ায় কোনো অস্থিরতা নেই। হাসির ধরনটা বিশিষ্ট: ঠোঁটে হাসি ফুটলে ভুরুদুটো কুঞ্চিত হয়, যেন আপত্তি জানিয়ে। মেয়েদের উপর হাসিটা অদম্য প্রভাব বিস্তার করে।

সে-রকম হাসি এখন সে হাসল।

মেহ্‌রিবানের ভোমা একবার কেঁপে উঠে আনত হল, যেন কোনো লোভের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব চলেছে।

'আপনার কাজ কেমন চলছে?'

তখনো অন্যজনের গলায় মেহ্‌রিবান উত্তর দিল:

'ধন্যবাদ। ঠিক চলেছে।'

'হয়ত আপনার কোনো সাহায্য দরকার?'

'না, ধন্যবাদ। কিছু দরকার নেই, কিছু না।'

আপনা থেকে চোখ তুলে তাকাল মেহ্‌রিবান, সে লাজুক চোখ যেন জিজ্ঞাসা করল: "কেন এসেছেন?"

হালকা হাসি হাসল জাকির, সে হাসি যেন জবাব দিল: "এমনি। নিজেই জানি না কেন।"

"এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো ঠিক নয়।"

"আমি তো যতক্ষণ খুশি দাঁড়াতে পারি!"

"কেন দাঁড়াবেন?"

"তুমি হয়ত চাও না আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি?"

নিঃশব্দ আলাপ চলেছে শুধু চোখের মাধ্যমে।

চকিতে গতকালের স্বপ্নটার কথা মনে হল মেহ্‌রিবানের, লাল হয়ে উঠল মুখ। তার নিজের অভিজ্ঞতা, গত ক' দিন তাকে যা উত্তেজিত করেছে, তারই ছায়া পড়েছে তো এই স্বপ্নে, তাই জাকির এসেছে বুঝি? মেহ্‌রিবানের স্বপ্নের জন্য জাকির তো দায়ী নয়! কিন্তু তার প্রতি অবিশ্বাসের এই অদ্ভুত ভাবটা কোথা থেকে এল? তার মূলে কি শুধু স্বপ্ন? কিম্বা হয়ত তার জন্য দায়ী সেই পূর্বাভাষ, স্বপ্নের আগের সেই পূর্বাভাষ যা তার অন্তরকে এত বিচলিত করেছে?

মেহ্‌রিবানের মুখভাবে হঠাৎ পরিবর্তনের কারণটা ধরতে পারল না জাকির। ভাবল হয়ত সেই পুরনো অপরাধটা — হয়ত এখন পর্যন্ত মেহ্‌রিবান তার রূঢ়তা ক্ষমা করতে পারেনি। কিন্তু নিজের অপরাধ স্খালনের জন্য সে সবকিছু করতে রাজী। সে জন্যই কি এখানে আসেনি? নিজেকে যাচিয়ে নেবার জন্য সে আবার মেহ্‌রিবানের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাল।

মেয়েটি ছোটখাটো, পাতলা গড়ন। শান্ত পরিষ্কার কপালে হালকা-বাদামি চুল লঘুভাবে এসে পড়েছে। নরম সরু বিনুনি কাঁধ ছুঁয়েছে। মেয়েটির পাণ্ডুরতায় জাকির বিস্মিত বোধ

করল। দেখে মনে হয় এই সেদিন অসুখ থেকে উঠেছে, কিম্বা হয়ত শরীর এখনো গড়ে ওঠেনি। কিশোরী মুখে অসাধারণ কিছু নেই, অন্যদের মতোই, যাদের সে দেখে কারখানায়। কিন্তু অন্যদের মতো তারো মনে নাড়া দিল মেহ্‌রিবানের গভীর বিষাদ আর অন্তরের অস্থিরতার ভাবটা। সে ভাব সর্বদা ফুটে থাকে তার চোখের গভীরে, এমন কি যখন হাসে, তখনো। হাসলে বাচ্চার মতো ফুটফুটে ঠোঁটটা অল্প বেঁকে যায়। জাকিরের মনে হল প্রতি মুহূর্তে এ মুখ তার কাছে আরো প্রিয় হয়ে উঠছে।

হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল:

'আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের দেখা হয় না?'

কেঁপে উঠল মেহ্‌রিবান, যেন জেগে উঠল। বিস্ফারিত চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল জাকিরের দিকে।

'আপনি যান,' অস্ফুটকণ্ঠে সে বলল।

মন ঠিক করে ফেলেছে এমনভাবে গোঁ ধরে জাকির বলল:

'আটটার সময়।'

'না!'

'তবে কখন?'

'কখনো নয়।'

'কেন?'

উত্তর দিল না মেহ্‌রিবান। স্তব্ধতা। শুধু কারখানার প্রাঙ্গণে পাম্পের গভীর নিশ্বাস, টেলিফোন-মেয়েদের একঘেয়ে কণ্ঠস্বর,

উপরে যন্ত্রাগার থেকে কন্‌ডেন্‌সেটর পর্যন্ত প্রসারিত মোটা পাইপের উপর বসা চড়ুই'এর অস্থির কিচির মিচির। জানলার তাকে রুটির গুঁড়ো খেতে বাধা দিয়েছে যে লোকটা সে কখন যাবে তার অপেক্ষায় আছে চড়ুইগুলি।

ভুরু কুঁচকিয়ে জাকির হাসল:

'আপনি আমার ওপর খুব চটেছেন দেখছি!'

তোতলাতে তোতলাতে মেহ্‌রিবান বলল:

'না, আমি... আমি চটিনি। আপনি যান কিন্তু। আর এখানে আসবেন না... আর আসবেন না!'

প্রত্যাখ্যানে জাকিরের গোঁ চেপে গেল।

'আমাদের দেখা হবেই হবে।'

'না। আপনি যান!'

'আর দেখা হবে আজ সন্ধ্যেবেলায়। আটটার সময়। "আজনেফ্‌ত"এর কোণটায় আমি আপনার অপেক্ষায় থাকব।'

'না, না, আমি যাব না!'

'দেরি করবেন না কিন্তু!'

উত্তরের অপেক্ষা না করে মেহ্‌রিবানের দিকে হাত নেড়ে চলে গেল সে।

'আমি যাব না। যাব না। দাঁড়ান একটু!'

শেষের কথাগুলো সে বলে প্রায় ফিসফিসিয়ে, যাতে মেয়েরা না শোনে। জাকির চলে যাচ্ছে দেখে মেহ্‌রিবান অসম্ভব বিচলিত বোধ করল, জানলার কাছে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কে যেন তার কাঁধে হাত রাখল। জামিলিয়া।

"যাব না। কিছুতেই যাব না," মনে মনে শক্ত হয়ে বলল মেহ্‌রিবান। "থাকুক দাঁড়িয়ে যতক্ষণ খুশি!"

যন্ত্রাগারের মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল জাকির। জামিলিয়া সোফায় বসে বইতে ডুব দিয়েছে। সুইচবোর্ডের সামনে বসল মেহ্‌রিবান। মহাখুশিতে কিচির মিচির করে চড়ুইগুলো আবার জানলার তাকে এসে রুটির গুঁড়ো ঠুকরে খেতে শুরু করেছে।

কয়েক মিনিট আগে যা এখনো তাই। কিন্তু সেটা শুধু আপাত দৃষ্টিতে। মেহ্‌রিবানের নিঃসঙ্গ জীবনে বিরাট একটা ঘটনা ঘটেছে। প্রিয়'র সঙ্গে মিলনে ডাক পড়েছে! কে সে? জাকির! স্বপ্ন সত্য হয়েছে, প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে!

স্বপ্নে জাকিরের সঙ্গে মেহ্‌রিবানের ব্যবহার অত্যন্ত সহজ, যেন কতকালের দোসর সে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার সামনে বাস্তব দ্বার খুলে দিয়েছে নিজের জগতের, সে জগৎ জটিল, অমীমাংসিত সমস্যায় কণ্টকিত। এ চৌকাঠ পার হবার মানে নিজের স্বপ্নের সঙ্গে বিচ্ছেদ, যে স্বপ্নের সঙ্গে তার কতদিনের অন্তরঙ্গতা! সে স্বপ্ন তাকে প্রথম দেখা দেয় বয়ঃসন্ধির সময়...

মেহ্‌রিবানের হাত কাঁপছে, সুইচবোর্ডের নম্বরগুলো ঝাপসা। কাজের প্রথম দিনের মতো এখন আবার ভুল হচ্ছে।

"না, যাব না, যাব না!.. আমি তো ওকে বলে দিয়েছি অপেক্ষার দরকার নেই। ওর ইচ্ছে হলে আসতে পারে, কিন্তু আমি থাকব না সেখানে!" বারবার বলল নিজেকে মেহ্‌রিবান

আর অপেক্ষা করে রইল হয়ত এখুনি জাকির টেলিফোন করে তাকে সাক্ষাতের কথা বলবে, আবার গোঁ ধরবে। চার নং ডিপার্ট থেকে যতবার ফোন আসে, গলা তার শুকিয়ে যায়।

মানুষের চরিত্র জটিল। জাকির ফোন করুক, কেন এত করে চাইছে মেহ্‌রিবান, কেন তার টেলিফোনের জন্য এত অধৈর্য প্রতীক্ষা তার? সে কি শুধু আবার "না" বলার জন্য? যদি সে নিজে যেতে না চায়, ব্যস, সব চুকে গেল! হয়ত তার ভয় যে দেখা না করলে জাকির অভিযোগের ফিকির পাবে, আবার তাকে ছাড়িয়ে দেবার কথা তুলবে? হয়ত টেলিফোনের প্রতীক্ষায় আছে এ জন্য যে জাকিরকে বুঝিয়ে বলবে যেন দেখা করতে না আসে, আর তাতে রাজী না হলে সাক্ষাৎটা পিছিয়ে দিতে? পিছিয়ে দিয়ে কী হবে শুনি? যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটির বিষয়ে সে ভেবে দেখতে পারে, যে স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠবে তার সঙ্গে নিজের সম্পর্কটা কী ঠিক করবে? কিম্বা হয়ত অন্য অনেক মেয়ের মতো মেহ্‌রিবান শুধু ন্যাকামি করছে। সবটা অভিনয়? না। সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে মেহ্‌রিবান। নতুন সম্পর্কে তার ভয়। তার ভয় এর উপসংহার হবে করুণ। তার মনে হল জাকিরের সঙ্গে খাপ খাবে না সে। অবশ্য তার স্বপ্ন দোসরের সঙ্গে অনেক আদল আছে জাকিরের, কিন্তু জাকির আরো সুন্দর।

"যদি এত সুন্দর না হত!" বিষণ্ণভাবে ভাবল মেহ্‌রিবান।

"আমি ওর একেবারে যোগ্য নই, আমাদের ভাব তাই বেশি দিন টিকবে না। অল্পদিনেই ওকে হারাব।"

স্বপ্ন কার না ভালো লাগে? নিঃসঙ্গ হলে লোকে আরো স্বপ্নপ্রবণ হয়। মেহ্‌রিবান নিঃসঙ্গ। সুন্দরকে সে ভালোবাসে, সবকিছুর মধ্যে খোঁজে সুন্দরকে। জীবনে তার দাবী দাওয়া খুব কম, কিন্তু কল্পনায়, স্বপ্নলোকে শুধু সুন্দরের মধ্যে বেঁচে থাকবে বলে সে ঠিক করেছে, সবকিছুতে সে সৌন্দর্য আরোপ করে।

যৌবনের গোড়াতেই সে নিজের হৃদয়কে সমর্পণ করেছে অশরীরী সখাকে, যার সঙ্গে জাকিরের এত আদল। কিন্তু বন্ধু যদি এত সুন্দর হয়, তাহলে নিজেকেও সে-রকম হতে হবে। মেহ্‌রিবান নিজেকেও দরাজ মনে সৌন্দর্য আরোপ করেছে — স্বপ্নে এটা করা কত সহজ! আর হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে স্বপ্ন সজীব হয়ে উঠল, কিন্তু আধখানা শুধু।

যদি জীবনের এই নিষ্ঠুর সত্য তার স্বপ্নজগতে হানা দেয় তবে দুজনের, মেহ্‌রিবান ও তার প্রিয়তমের অপরূপ বন্ধুত্ব ছারখার হবে নিঃসন্দেহে, আলাদা হয়ে যাবে দুজনে, বিশ্বাসের ডোর ছিন্ন হবে। নিজেদের মায়াজগতে তারা কী সুখে, কী আরামে ছিল, সে জগতে তারা কত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়! সে জগৎ হারালে, নিজের নিঃসঙ্গ আনন্দ হারালে মেহ্‌রিবানের নিঃসঙ্গতা আরো বেড়ে যাবে। তাই সে ঠিক করেছে কাছে এসে দুতিন

বার দেখার পর চিরকালের জন্য জাকিরকে হারানোর চেয়ে তাকে দূর থেকে দেখা ভালো।

সবচেয়ে খাঁটি কথা এটাই। যে আবছা নতুন অনুভূতি তাকে আনন্দে ভরে দিয়েছে, তাকে কখনো অস্থির কখনো মাতাল করে দিচ্ছে, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ মেহ্‌রিবানের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ংকর। তার সবচেয়ে বড়ো ভয় যে, জীবনের নিষ্ঠুর সত্যের ছোঁয়াচ লাগলে এ অনুভূতি টিকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে।

"হয়ত ও একেবারে অন্য কারণে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়," ভাবল মেহ্‌রিবান। "কি জানি, হয়ত ও কিম্বা ওর বাবা আমার বাবাকে কখনো চিনত, আমাকে জরুরী কোনো কথা বলতে চায়? আর আমি মিছিমিছি কী সব ভেবে নিয়েছি! কিন্তু তা তো নয়। আমার বাবার বিষয়ে কিছু বলতে চাইলে এখানেই জানলায় দাঁড়িয়ে বলতে পারত, বলতে পারত টিফিনের সময়। তার জন্য সহরে দেখা সাক্ষাতের দরকার নেই। সবাই বলে যে 'আজনেফ্‌তের' কাছে সমুদ্রতীরের রাস্তায় অভিসারের জন্য লোকে ডাকে—জায়গাটা ও ধরনের। না, ওখানে যাই হোক না কেন আমি যাব না!"

ভাবতে ভাবতে সে এত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল যে সুইচবোর্ডে কী চলেছে তার হুঁশ ছিল না, কার সঙ্গে কাকে যুক্ত করছে তার খেয়াল নেই। "হায়, যদি ও ফোন করত!" কাতরভাবে ভাবল মেহ্‌রিবান।

কে যেন সিমুজারের টেলিফোনে চেঁচাল:

'শুনছেন? আপনাদের ওখানে কী চলেছে বলুন তো! এইবার নিয়ে প্রায় দশবার ফিটারদের ডিপার্ট চেয়েছি, কখনো পাচ্ছি সরবরাহ বিভাগ, কখনো কর্মচারী বিভাগ, কখনো বা ঘাট!'

তাড়াতাড়ি কনেক্সন্ দিয়ে সিমুজার ফিরে মেহ্‌রিবানকে ভালো করে দেখে নিল। অন্যদের নিয়ে তার চিন্তা নেই। মেহ্‌রিবানের মুখভাব দেখে তার ভালো লাগল না। জামিলিয়াকে আদেশ দিল:

'ওর জায়গা নাও!'

মেয়েদের মধ্যে জামিলিয়াকে সবচেয়ে পছন্দ সিমুজারের। মেয়েটি চুপচাপ, বিনীত, তাছাড়া মনে হয় কাজ আর বই ছাড়া ওর কিছু নেই। তাই ভালো লাগত। অভ্যাসমতো মেহ্‌রিবানের কাঁধ ছুঁল জামিলিয়া। মেহ্‌রিবান চমকে উঠে দাঁড়াল।

'এ-দিকে এসো,' সিমুজার ডাকল।

পড়া-না-করা স্কুলের মেয়ের মতো মেহ্‌রিবান এগোল তার কাছে। অবিরাম টেলিফোন কলের জবাব দিতে দিতে সিমুজার জিজ্ঞেস করল:

'আজ কী হয়েছে তোমার?'

'জানি না...'

'অসুখ করেনি তো?'

'জানি না।'

'তাহলে যাও!'

'কোথায়?' সজাগ হয়ে উঠল মেহ্‌রিবান।

'বাড়ি।'

করুণ চোখে নিজের সুইচবোর্ডের দিকে, অন্য মেয়েদের দিকে তাকাল মেহ্‌রিবান, তারপর গেল দরজার দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল:

'আমার আসার আর দরকার নেই?'

তার দিকে না চেয়ে, গলা নামিয়ে সিমুজার বলল:

'আসবে না কেন? বিশ্রাম করে কাল এসো। কাল আমরা দ্বিতীয় সিফ্‌টে, দেরি করো না। আমি কর্মচারী বিভাগে তোমার কথা বলেছি, কাল থেকে তুমি পাকা হয়ে যাবে।'

আনন্দে চোখে জল এল মেহ্‌রিবানের। মনে হল চুপচাপ, কড়া প্রকৃতির সিমুজারকে জড়িয়ে ধরে, চেঁচায়, লাফায় ছোট্ট মেয়ের মতো।

সে-রকম কিছু অবশ্য করল না মেহ্‌রিবান। বিচলিত কণ্ঠস্বরে শুধু এইটুকু বলতে পারল:

'অনেক ধন্যবাদ! আপনি সুখী হোন!'

কথাগুলো শুনে নিমেষের জন্য সিমুজার ভাবল: "কেন এটা বলল? আমি বুঝি সুখী নই? আমার তো সবই আছে: বাড়ি, বাবা-মা, ভাই; ভাইপো, মনের মতো কাজ। সুখের জন্য আর কী চাই?"

হাসল সিমুজার, সে হাসিতে আনন্দ নেই।

"সবকটা মেয়ে সুখ বলতে বুঝি শুধু একটা জিনিস বোঝে। একেবারে বাচ্চা।"

দরজার দিকে ফিরে তাকাল সিমুজার। মেহ্‌রিবান চলে গিয়েছে।

৫

বাড়িতে ফিরে মেহ্‌রিবান ঠিক করল সে মুহূর্তেই বাবাকে চিঠি লিখে জানানো দরকার যে কাজ পেয়েছে। লেখার টেবিলে বসে লাইনটানা খাতার দুটো পাতা ছিঁড়ে ভালো করে ভেবে নিয়ে শুরু করল:

"বাবা, আমি তো এরিমধ্যে কাজ করছি। তৈলশোধন কারখানায় টেলিফোন অপারেটরের কাজ। আমাকে নিয়ে ভেবো না, আমি এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি। নিসা-খালার ধার শোধ করেছি। শুধু ঘরভাড়াটা বাকি — মাইনে পেলেই দিয়ে দেব। ঠাকুমা মারা যাবার পর প্রথম প্রথম রাতে একলা ভয়ানক ভয় করত, কিন্তু এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। এ বছরে সান্ধ্যস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর পড়া শেষ করব। আমি যাদের সঙ্গে কাজ করি তারা সবাই খুব ভালো মেয়ে..."

গত কদিনে যা ঘটেছে তার খুঁটিনাটি বিবরণ বাবাকে জানাল মেহ্‌রিবান। তার ইচ্ছে চিঠিটা যেন হাসিখুশি আর জীবন্ত শোনায়। শুধু জাকির আর সামোভার ও অন্য জিনিসগুলো

বেচার কথা চেপে গেল। চিঠির শেষে বাড়ির সবাইকে শুভেচ্ছা জানাল।

"...বিশ্বাস করো, বাবা, তোমার কাছ থেকে আর কিছু চাই না। তোমার সংসারে যেন সর্বদা সুখশান্তি থাকে! শুধু একটা অনুরোধ — মাঝে মাঝে চিঠি দিও। আর যদি পারো বাচ্চাদের ছবি পাঠিও। এখানে আমি তো একেবারে একা..."

তার গলাটা আটকে গেল, কথাটা শেষ করতে পারল না। তাড়াতাড়ি সই করে খামে চিঠি ভরে ঠিকানা লিখল: রিগা, কালেয়ু স্ট্রীট...

তারপর হাতদুটো অসাড় হয়ে নেতিয়ে পড়ল, মাথা নিচু করে বসে রইল মেহ্‌রিবান। আশেপাশের সবকিছু এতো নিরানন্দ, ব্যথায় মন ভরে যায়। আবার তার মনটা টনটন করে উঠল, অনুভূতি হল যে তার জীবনে সবচেয়ে বড়ো কী একটার অভাব আছে। লোকজনের সঙ্গে তার জানাশোনা অত্যন্ত কম, চারিদিককার পৃথিবী সম্বন্ধে তার জ্ঞান কতোটুকু। যেন শৈশবের ঘুম সবেমাত্র ভেঙেছে, জেগে উঠে অবাক হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে ক্রমাগত ভাবছে জীবনে যা ঘটছে তার মানে কী। অনাদরের মেয়েটির মনে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে বাপের সঙ্গে ঘোরা সহরগুলির স্মৃতি, কুয়াশায় ভরা অবসন্ন স্বপ্নের ভিড় যেন। স্বপ্নের ঘোর কাটল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু যখন কাটল তখন সে আর কিশোরী নয়, তরুণী।

স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠ সংসারে বেড়ে-ওঠা ছেলেমেয়েরা

সাধারণত সাহায্য চায় বড়োদের কাছে, বাবা মা, ভাই বা বোনের কাছে। কিন্তু মেহ্‌রিবানকে পরামর্শ দেবে কে? এখানে তার আত্মীয় কেউ নেই, কাজের সঙ্গিনীদের সঙ্গে এখনো আসল অন্তরঙ্গতা হয়নি। প্রতিবেশিনী নিসাবেইমকে তার লজ্জা করে।

আজ আটটার সময় জাকির তার অপেক্ষায় থাকবে "আজনেফ্‌ত"এর কোণে। যাবে কি যাবে না? কঠিন প্রশ্নটির ফয়সলা করা চাই। কিন্তু ফয়সলা কি এরিমধ্যে হয়নি? নিজেকে তো বারবার দৃঢ়ভাবে বলেছে যে যাবে না। তাহলে আবার দোমনা কেন? সকালের সংকল্প কি যথেষ্ট দৃঢ় ছিল না? সেটা হৃদয় থেকে আসেনি, এসেছে বুদ্ধি থেকে, তাই যখন হৃদয় ডাকল, নিজের বায়না শুরু করল, তখন মেহ্‌রিবানের অন্তরে সংগ্রাম শুরু হল। বুদ্ধি বলল: "যাস না!" কিন্তু আশার পাখা মেলে হৃদয় উড়ে গিয়েছে সেখানে, মিলনের জায়গায়। বিপদের কথা জানাল বুদ্ধি, বলল লোভ সামলানো উচিত, কিন্তু হৃদয় বাধাবন্ধহীনভাবে নিজেকে ছেড়ে দিতে চাইছে লোভের হাতে। বুদ্ধি সেয়ানা, হৃদয় মাতাল। বুদ্ধি হল কাপুরুষের মতো, হৃদয় কোনো ভয় মানে না।

"আমার সঙ্গে দেখা করতে ও চায়, তার মানে আমাকে একটু পছন্দ হয়েছে?" কথাটা মনে হওয়াতে উষ্ণ একটা অনুভূতি আচ্ছন্ন করল তাকে, চামড়ার নিচে পর্যন্ত শিরশির করে উঠল। "হয়ত আমাকে আরো ভালবাসবে, আমি সুখী হবো? হ্যাঁ, যাই হোক না কেন, আমি যাব... মানুষটিকে তো

বুদ্ধিমান, সিরিয়স্ মনে হয়। ওর কোনো বদ মতলব থাকতে পারে না, আমার ক্ষতি ও করবে না।"

সাক্ষাতের জন্য তৈরি হতে শুরু করল মেহ্‌রিবান। সবসুদ্ধ তিনটে পোষাক তার। একটা শীতের, শাল থেকে সেলাই; দ্বিতীয়টা তো পরনে — কাজের জন্য; তৃতীয়টি জ্বলজ্বলে রঙের সিল্‌ক্, রিগা থেকে আনানো। একবার বাপের চোখে পড়ে যে মেহ্‌রিবানের সব পোষাক ছোট হয়ে গিয়েছে, তখন কথা দেয় নতুন একটা কিনে দেবে। কিন্তু বাজে খরচা এড়াবার জন্য সৎমা পুরোনো একটা পোষাক দেয়। সেটার অদলবদল করে বেড়াবার মতো ঠিকঠাক করে নিল মেহ্‌রিবান; উৎসবের দিনে বা থিয়েটারে যাবার পোষাক সেটা। কিন্তু পোষাকটা এরিমধ্যে অনেকটা জীর্ণ হয়ে পড়াতে মেহ্‌রিবানকে বেশ সাবধানে চলতে হত। ধোয়াকাচার ফলে একটু ফেঁসেছে জিনিসটা। যতদিন পারে পোষাকটাকে টিকিয়ে রাখার ভয়ানক আগ্রহ মেহ্‌রিবানের, অনেক চেষ্টায় রিপু আর সেলাই করেছে, কিন্তু তবু জায়গায় জায়গায় সেটা ফেঁসে যাচ্ছে। এখন মেহ্‌রিবান প্রথমে ইস্ত্রিটা গরম করে নিল, তারপর আলমারির দেরাজ খুলে সাবধানে পোষাকটা বের করে দেখল। ডান কাঁধে একটা ফুটো। বাড়তি রেশমের সুতো সুকৌশলে বের করে মেহ্‌রিবান রিপু করতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক গেল এ কাজে। তারপর চুল আঁচড়ে মেহ্‌রিবান সযত্নে বিনুনি বাঁধল, সাবধানে পোষাকটা পরে গেল আয়নার

কাছে। মুখের পাণ্ডুরতা দেখে তার কী হতাশা! “কই তবু তো ভালো দেখাচ্ছে না!” কিন্তু যে সর্বদা তার নিঃসঙ্গতার সহচর সেই স্বপ্ন হঠাৎ ফিসফিসিয়ে বলে উঠল: ‘না, তুমি সুন্দর, মেহ্‌রিবান! মানুষের সৌন্দর্য তার চোখে। দেখ তো, তোমার চোখ কেমন দীপ্ত হয়ে উঠেছে — এর বদলে সারা দুনিয়া দিলেও আমি নেব না! ও চোখে আছে জীবনের উষ্ণতা, প্রেমের উত্তেজনা, স্নিগ্ধ করুণা, বিশ্বাস আর শুচিতা। আমার চোখে নিজেকে দেখ, মেহ্‌রিবান। সুন্দর তুমি। হৃদয় তোমার শুদ্ধ, ভোরের আকাশের মতো, আর এ শুদ্ধতা মূর্ত হয়েছে তোমার দৃষ্টিতে। তোমার হৃদয়ের ধন এখনো কারো কাছে উজাড় হয়নি, তোমার চোখের দিকে শুধু তাকিয়েই বোঝা যায় কত সম্ভার লুকিয়ে আছে তোমার হৃদয়ে।” কোথা থেকে এল এ শব্দগুলি? কোনো বইতে কি পড়েছে? হয়ত তাই। কিন্তু এখন শুধু নিজের স্বপ্নের কাছে সে শুনল কথাগুলি।

“না, তুমি সুন্দর, মেহ্‌রিবান। মানুষের সৌন্দর্য তার চোখে...”

এ কদিন এত হিসেব করে খেয়েছে যে বেশ রোগা হয়ে গিয়েছে মেহ্‌রিবান, পোষাকটা আরো ঢিলে হয়েছে। ব্যাপারটা খারাপ।

ঘুরে সাধারণ দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল মেহ্‌রিবান। এখনো আধঘণ্টা বাকি আটটা বাজতে। উত্তেজনায় কিন্তু

এরিমধ্যে গলা আর কপাল ঘামে ভিজে গিয়েছে। সখেদে সে ভাবল, তার কাছে এমন কি ও-ডি-কলোনের ছোট্ট শিশি পর্যন্ত নেই, সেণ্ট তো দূরের কথা। গোলাপপাশে চোখ পড়ল — রূপোর পুরোনো জিনিসটা জানলার তাকে রয়েছে। ঠাকুমার মৃত্যুদিনে নিসাবেইম গোলাপজলে এটাকে ভরে — বলে ও হল "গোলাপের অশ্রুবিন্দু"। মৃতাকে শেষ বিদায় জানাতে যারা আসে তাদের সবায়ের হাতে মুখে গোলাপজল দেওয়া হয় — পুণ্য বারিতর্পণ।

গোলাপপাশ হাতে নিয়ে সাবধানে মেহ্‌রিবান ঝাঁকাল। সুগন্ধি জলের তলানি তখনো কিছুটা ছিল। গলায় আর রগে কিছুটা মেখে নিল মেহ্‌রিবান। অস্পষ্ট মৃদু গন্ধে তার মনে পড়ে গেল সেই বিষণ্ণ দিনটির কথা। মৃত্যুর আগের দিনকটিতে ঠাকুমা আজার-হানুম রোগে এত ভোগেন যে শরীরটা একেবারে শুকিয়ে যায়, ছোট্ট হয়ে যায়, প্রায় অস্টাবক্রের মতো তিনি ঘরে অস্থিরভাবে ঘুরতেন। মৃত্যুর পর আবার সোজা হয়ে যান, এত সোজা যে দেখে মেহ্‌রিবানের বিশ্বাস হল না যে মানুষটি তার ঠাকুমা। প্রতিবেশিনী ও পরিচিতরা মৃতাকে শেষবার দেখতে এসে অনেক কাঁদে। উরতে করাঘাত করে নিসাবেইম বিলাপ করে এই বলে যে তার হতভাগিনী বোনটি ছেলের কাছে সুখের মুখ দেখেনি।

মেহ্‌রিবান কাঁদেনি। বিস্ফারিত অপলক চোখে সবকিছু সে দেখে, চোখে আসে বিষণ্ণ বিস্ময়ের ভাব। যন্ত্রচালিতের

মতো চা দিল, গেলাস নিয়ে ধুল, বুড়ীদের কাছ থেকে চাদর নিয়ে রাখল সিন্দুকে।

আজার-হানুমকে কবর দেওয়া হল। আচারমতে তর্পণ হল, তিনবার — তৃতীয়, নবম এবং চল্লিশ দিনের দিন। অবশেষে মৃতাকে তার শেষ প্রাপ্য দেবার পর সবাই চলে গেল, একা রইল মেহ্‌রিবান। চল্লিশ দিন নিসাবেইম রাত কাটিয়েছে তার সঙ্গে। যথাসাধ্য তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। তৃতীয় স্মৃতিতর্পণের পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিসাবেইম বলল:

'সব শেষ... বাছা, আজ না হয় কাল আমাদের সবাইকে তো যেতে হবে ওখানে। আমাদের ভালো কাজ শুধু আমাদের পরে বেঁচে থাকে।'

সে রাত্রে মেহ্‌রিবান একলা। সকাল পর্যন্ত ঘুম আসেনি। এই প্রথম সে বুঝল যে ঠাকুমা আর কখনো ফিরে আসবেন না। তখন জল এল চোখে, ভীষণ কান্না কাঁদল মেহ্‌রিবান। সে কিন্তু মৃতা ঠাকুমার কথা ভেবে ভয় পায়নি, ভয় পেল অন্য কিছুতে। সবসময় মনে হল ঘরে আর কে একটা রয়েছে, সে ঘুরছে, তার নিশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। কয়েক বার আতঙ্কে খাট থেকে লাফিয়ে নেমে আলো জ্বালাল সে, সবকটা কোণে চেয়ে দেখল, এমন কি রান্নাঘরেও গেল। চুপচাপ, কিছু নেই। কিন্তু আলো নিভিয়ে শুলেই আবার কে যেন এসে নিশ্বাস ফেলে। মেহ্‌রিবান এত ভয় পেল যে ইচ্ছে হল নিসাবেইমের দরজায় টোকা দিয়ে জাগিয়ে সাহায্যের জন্য ডাকে বা বলে যে

তার ঘরে রাত কাটাবে। কিন্তু সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে দাঁত চেপে মেহ্‌রিবান সকাল পর্যন্ত সহ্য করে রইল। সারা রাত ঘুম এল না। আলো নেভাবে না ঠিক করল, তাতে অনেকটা স্বস্তি।

সে স্মৃতি মেহ্‌রিবানের মনকে আসন্ন সাক্ষাৎ এবং তার সঙ্গে জড়িত উত্তেজনা থেকে অল্প বিক্ষিপ্ত করল। বেরোবার সময় হয়েছে। শেষবার আয়নায় চোখ বুলিয়ে মেহ্‌রিবান বেরোল।

দোতলার সিঁড়িতে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গেল নিসাবেইমের সঙ্গে; বিব্রত হয়ে মেহ্‌রিবান দাঁড়াল।

'কোথায় চললে, বাছা?' ভালো করে তাকে দেখে নিয়ে নিসাবেইম শুধাল, দম নেবার জন্য সে-ও দাঁড়িয়েছে। গতরখানি ভারি, বয়স হয়েছে, তাই সিঁড়িভাঙ্গা তার পক্ষে কষ্টকর।

মেহ্‌রিবান লাল হয়ে উঠল।

'আমি... আমার একটা কাজ আছে, নিসা-খালা...'

তীক্ষ্ণবুদ্ধি নিসাবেইম মৃদু হাসল:

'দিলকা ব্যাপার মনে হচ্ছে? সাজগোজ করেছ দেখছি...'

আর কিছু যাতে জিজ্ঞেস না করে তাই মেহ্‌রিবান তাড়াতাড়ি পাল্টা প্রশ্ন করল:

'তুমি কোত্থেকে, নিসা-খালা?'

'মেয়ের ওখানে গিয়েছিলাম। আবার খামখেয়ালিপনা শুরু

করেছে — এটা খাব না, ওটা চাই না, এটা পারব না। পোয়াতী মনে হচ্ছে। দেখে এলাম, কিছু আচার দিয়ে এলাম ওকে।'

চোখ নামিয়ে মেহ্‌রিবান জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে নিসা-খালা সবসুদ্ধ তোমার কটি নাতি হবে?'

'এগারোটি,' সগর্বে সোজা হয়ে দাঁড়াল নিসাবেইম। 'শীগগিরই একটা পাঠশালা খুলতে হবে দেখছি। আর আল্লার কৃপায় তোমার যখন সাদি হবে, থিয়েটারে যাবার সময় বাচ্চাদের তুমিও রেখে যাবে আমার কাছে... পোষাকটা তোমাকে বেশ মানিয়েছে। তোমার তাহলে দিলকা ব্যাপার? বেশ তো, সময় হয়েছে বইকি! দেখ, কিছুর দরকার হলে লজ্জা করো না বাপু, উপদেশ টুপদেশ যদি দরকার হয় নিসা-খালার কাছে এসো। আমি এখন তোমার মা'র মতন, তোমার ঠাকুমাও। আল্লা করুন, শতজীবী হও তুমি। তোমাকে দেখাশোনার ভার আজার-হানুম আমাকে দিয়ে গেছে, বলেছে তোমার মা'র জায়গা নিতে।'

'ধন্যবাদ, নিসা-খালা... আমি যাই তাহলে। আজ কারখানায় মিটিং আছে...'

আর একবার মেহ্‌রিবানের সলজ্জ মুখ আর বেশভূষা দেখে নিয়ে নিসাবেইম সবজান্তার সুরে বলল:

'বেশ, বাছা, যাও। কিন্তু খুব বেশি দেরি করো না। রাত করে বাড়ি ফেরা মেয়েদের উচিত নয়। যাও বাছা, তোমার মিটিঙে না কোথাও, যেখানে হোক।'

বকুনতুড়ে বুড়ীর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে মেহ্‌রিবান তড়তড় করে নিচে নামল। দেরি হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি 'আজনেফ্‌ত'এ হাজির হবার জন্য সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নিল মেহ্‌রিবান, গেল অলিগলি দিয়ে। গলিতে ফুটবল খেলিয়েরা কষে বল পিটছে, তাদের মধ্যে পথ করে লেরমন্তভ স্ট্রীটে এসে মেহ্‌রিবান চলল সারাইকিনের দিকে। সামনে রাস্তার ওদিকে লাল পাথরের প্যারাপেট পেরিয়ে চোখে পড়ে সহরের প্রশস্ত দৃশ্য, বিরাট এ্যাম্ফিথিয়েটারের মতো সমুদ্রের দিকে সহরটা নেমে গিয়েছে। গোধূলি নেমেছে। প্যারাপেট পেরিয়েই পার্ক, পাইন, উইলো আর সাইপ্রেস গাছের নরম চূড়ার মাঝে চোখে পড়ে পীরোজা রঙের সমুদ্র। ঘাটে স্টীমার, লঞ্চ, বজরা; হরেক্ রকমের জাহাজ দূরে আন্দোলিত, কয়েকটা নোঙরের কাছে আসছে, কয়েকটা চলে যাচ্ছে। প্রথম ভীরু আলো জ্বলে উঠল এখানে ওখানে। চওড়া সিঁড়ি হয়ে ছুটেছে মেহ্‌রিবান, কিশোরীর মতো মাঝে মাঝে পা দিয়ে মাটি চেপে, চটি অল্প এক পেশে করে যাতে জুতোর হিল ক্ষয়ে না যায়। শেষের দিকে সিঁড়ির দুটো দুটো ধাপ তড়তড় করে পার হল। গলা থেকে খুলে গেল স্কার্ফ, শূন্যেই সেটাকে ধরে ফেলে বাইলভ স্ট্রীটের দিকে যে পথটি গিয়েছে সেটাতে চলল সে না থেমে। ট্র্যামলাইনে এসে মোড় নিল "আজনেফ্‌ত"এর দিকে। নির্দিষ্ট জায়গায় না গিয়ে বেশ কয়েক কুড়ি পা আগে মেহ্‌রিবান থেমে পড়ল: জাকির নেই।

"হয়ত একদম আসেনি?" কথাটা ঝিলিক দিয়ে উঠল মাথায়। ব্লাউজের হাতা থেকে ছোট্ট রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিল মেহ্‌রিবান। দম নেবার জন্য দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে হল।

এখান থেকে "আজনেফ্‌ত"এর মোড়টা স্পষ্ট চোখে পড়ে। ওটা আর তার মধ্যকার ব্যবধানটা পেরোবার সিদ্ধান্ত কিছুতেই সে করে উঠতে পারল না। মানুষ আর মোটরগাড়ির অবিরাম স্রোত কোণটায় মোড় নিচ্ছে। মোটরবাস থেকে যাত্রীরা নেমে ফুটপাথ ভরিয়ে দিচ্ছে, তারপর আবার ফাঁকা।

"মিছিমিছি দাঁড়িয়ে নেই তো?" সন্দেহে জর্জরিত মেহ্‌রিবান। "হয়ত ও এসে আর দাঁড়ায়নি, চলে গিয়েছে? না, অত তাড়াতাড়ি যেতে পারে না। ও তো নিজেই জেদ করে এখানে আসার। হয়ত কিছু একটা কাজে আটকা পড়েছে, পরে আসবে। নিশ্চয় আসবে, আসবে নিশ্চয়!"

সমুদ্রের সিল্‌ক-মসৃণ বুক মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় কুঞ্চিত হচ্ছে। উত্তপ্ত মুখ ঠাণ্ডা হাওয়ার দিকে ফিরিয়ে মেহ্‌রিবান গভীর নিশ্বাস নিল।

রাস্তার দুধারে আলোর মালা জ্বলে উঠল। সমুদ্রের বুকে নামল কুয়াশা। মাঝে মাঝে বড়ো রাস্তা লোকের ভিড়ে উত্তাল হয়ে উঠছে, ভিড় বাড়ছে, তারপর আবার ফাঁকা, চুপচাপ। সমুদ্রতীর, বুলেভার আর সমুদ্রে নিঃশব্দতার রাজত্ব।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মেহ্‌রিবান। বড়ো রাস্তায়

বেশ আলো, যে কোণটা মেহ্‌রিবান নজরে রেখেছে সেটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। এখনো কেউ আসেনি। জাকিরকে দোষ দেবার মতো শক্তি নেই মেহ্‌রিবানের। বরং তার চিন্তিত লাগল। অসুখ হয়নি তো জাকিরের, কিছু একটা ঘটেনি তো? গাড়িগুলো তো আর হর্ণ দিচ্ছে না, কেমন তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে! না, না, কিছু হতে পারে না!

সামেদ ভুরগুন নামের সিনেমাটা একেবারে সমুদ্রতীরে, সেখানে ভিতরকার আলো নিভে গেল, ছবি শুরু হয়েছে। বাইরে সিনেমার সুন্দর থামগুলিতে শুধু বিজ্ঞাপনের আলো। প্রথমে আবহসঙ্গীত, তারপর কোরাস-গান।

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে আর পারল না মেহ্‌রিবান, দেয়াল বরাবর পায়চারি করতে লাগল। "এই তো ছবি শুরু হয়ে গেল," দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে ভাবল, "গানটা ভারতীয় মনে হচ্ছে। দেরি হয়ে গেছে, ও আর আসবে না। ও কে? কোণে এসে দাঁড়িয়েছে, ওখানটায়?" আর একটু হলে ছুটে সেখানে যেত মেহ্‌রিবান, কিন্তু নিজেকে সামলাল — জাকির নয়। কোণে এসে একটি যুবক দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরাল। দেশলাই'এর কাঠিটা নিবিয়ে জোর-চলতি একটা গাড়িতে ছুঁড়ে দিল। তারপর ফুটপাথে পায়চারি। নিজের জায়গায় ফিরে গেল মেহ্‌রিবান। "আর দাঁড়াবার মানে হয় না। চলে যাব? না আর একটু দেখে যাব?" যেখানে সে দাঁড়িয়েছে দেয়ালের নিচে সেখানটা মোড়টার তুলনায় অন্ধকার।

জাকিরের সঙ্গে দেখাটা কল্পনা করার চেষ্টা করল মেহ্‌রিবান। মেহ্‌রিবানকে দূর থেকেই ও নিশ্চয় চিনত। দেখে কী খুশি না হত! কাছে এসে দাঁড়াল, অভ্যাস মতো হেসে, ভুরু কুঁচকে। আবার মেহ্‌রিবান ভাবল, "কী সুন্দর ওকে দেখাত, আমার মতো নয়! এত সুন্দর হবার কী দরকার!"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি কথা রাখবেন, আসবেন না," বলত জাকির। তার কথায় অভিযোগের আভাস পেল মেহ্‌রিবান। উত্তরটা ঠিকমতো তার মুখে জোগাত না, অনেকটা এই ধাঁচের হল: "আমি তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি, বলতে এসেছি যে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না।" তারপর মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে বলত, "জানেন, আমি জীবনে এর আগে কখনো কারো সঙ্গে এভাবে দেখা করতে আসিনি।" আর খাঁটি কথাটা শুনে জাকির সবজান্তার মতো হেসে বলত, "হ্যাঁ, শুরু করাটাই সবচেয়ে মুশকিল!"

তার বেশভূষা আর উত্তেজিত মুখ দেখে জাকির নিশ্চয়ই বিশ্বাস করত না যে সাক্ষাৎটা বরবাদ করার জন্যই তার এখানে আসা। সাবধানে তার হাত ধরত জাকির, কিন্তু সে হাত ছাড়িয়ে পিছিয়ে যেত। এর পর বোধ হয় কিছুক্ষণ চলত অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা।

"চলুন, মেহ্‌রিবান!"

"কোথায়?"

"যেখানে ইচ্ছে ... চলুন সমুদ্রের ধারে যাই, ওখানে ঠাণ্ডা।"

বাধা না জানিয়ে মেহ্‌রিবান জাকির যেখানে নিয়ে যেত সেখানে যেত। জাকির যদি বাতাস হত, তাহলে ছোট্ট লঘু মেঘের মতো তার ঝাপটায় নিজেকে ছেড়ে দিত মেহ্‌রিবান। তার নিশ্বাস তাকে স্পর্শ করলে মেহ্‌রিবান কুসুমিত হয়ে উঠত, বসন্তের প্রথম উষ্ণ নিশ্বাসে ফুলের মতো; ও যদি দুরন্ত ঝড় হত মেহ্‌রিবান তাহলে বিক্ষুব্ধ হত সমুদ্রের মতো।

মন্থর পায়ে মেহ্‌রিবান বাড়ি ফিরল। দরজা খুলে অবাক চোখে নিজের ঘরটা দেখল।

মেহ্‌রিবানের ঘরে তালার শব্দ নিসাবেইমের কানে যেতে সন্দেহের জন্য নিজেকে সে ধমকাল: "বেচারী, সত্যি সত্যি তাহলে কোনো একটা কাজে গিয়েছিল। আর আমি কী সব ভেবে বসে আছি!"

আবার নিজের স্বপ্নের কাছে ফিরে এল মেহ্‌রিবান। ঘরটা গুমোট। বেশভূষা আর মোজা খুলে ঘরে পায়চারি করতে লাগল সে। শরীর ঘর্মাক্ত, খালি ছোট পায়ের ভিজে ছাপ পড়েছে জীর্ণ, অনেক দিন রঙ-না-করা মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে দাগগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অবসাদে ছিন্নলতার মতো সে শুয়ে পড়ল খাটে।

৬

পরের দিন স্কুলে পড়া শেষ করেই মেহ্‌রিবান কারখানায় গেল। সন্ধ্যার সিফ্‌ট। করিডরে নোটিশবোর্ডের কাছে মেয়েরা তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। মেহ্‌রিবানকে দেখামাত্র মাহ্‌বুবার ইশারায় সবাই একটা গানের কলি গেয়ে উঠল আচমকা।

"ওদের এত ফূর্তি কেন?" বিব্রত হয়ে থমকে দাঁড়াল মেহ্‌রিবান। দেখল যে এমন কি জামিলিয়া পর্যন্ত গেয়েছে। একমাত্র লেইলা বেশ গোল হওয়া পেটে হাত রেখে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে স্মিত হাসি।

করিডরের ও কোণ থেকে সিমুজারের আবির্ভাব হল। খুঁড়িয়ে হাঁটলেও চলে বেশ তাড়াতাড়ি। হৈ হৈ করা মেয়েদের চেঁচিয়ে বলল:

'কী হচ্ছে শুনি? কিসের জন্য এত হৈ চৈ?'

'মেহ্‌রিবানকে অভিনন্দন জানাচ্ছি!'

'মেহ্‌রিবান পাকা চাকরী পেয়েছে!'

'এখন ও ষোলো আনা টেলিফোনের মেয়ে!' উচ্চকিত আনন্দের সুর ধ্বনিত হল করিডরে।

সিমুজারের মুখে হাসির একটা ঝিলিক।

'হুঁ! দারুণ একটা কাণ্ড ঘটেছে দেখছি! এবার নিজের নিজের জায়গায় যাও তো!'

সিমুজার এগিয়ে ঢুকল এক্স্চেঞ্জে, মেয়েরা দরজার কাছে জোট পাকিয়ে দাঁড়াল।

'আমাদের উপহার কই?' ভালিদাকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল মাহ্বুবা। মাহ্বুবা ব্যস্ত হয়ে নিজের থলি হাতড়ে একটা বাক্স বের করল। বাক্স খুলে সাইবেরিয়ার পাথর বসানো সোনালি-নীল একটা প্রজাপতি বের করে মেহ্রিবানের বুকে আটকে ভারিক্কিভাবে বলল:

'আমাদের নতুন বন্ধু ও সহকর্মীকে অভিনন্দন জানাই! হুররে!'

'হুররে!' বাকি সবাই হাঁকল, তারপর হাসতে হাসতে মেহ্রিবানকে টেনে নিয়ে গেল এক্স্চেঞ্জে।

আগেকার সিফ্টের মেয়েরাও অভিনন্দন জানাল মেহ্রিবানকে। আনন্দে বিহ্বল মেহ্রিবান শুধু ফিসফিস করে বলতে পারল: 'ধন্যবাদ... অনেক ধন্যবাদ!'

সুইচবোর্ডের সামনে বসে কাজ শুরু হল। এখন পাকা টেলিফোনের মেয়ে, হয়ত তাই, বা এখানে সবাই তার সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার করে সে জন্য বোধ করি এ সিফ্টে সে কাজ করল আরো আস্থার সঙ্গে। মনে হল নম্বরগুলি কোথায় তার বেশ ভালোভাবে জানা, সুরকারের কাছে যেমন স্বরলিপি, টাইপিস্টের কাছে যেমন যন্ত্রের চাবি। তাছাড়া লোকদের কল মতো চটপট নির্ভুলভাবে নম্বর দিয়ে বা বন্ধ করে বেশ খুশি লাগছে, যেন জটিল কোনো যন্ত্র বাজানো। মনে হল

টাইপরাইটারে সনার সেই আশ্চর্য স্পিড এখন আর তেমন একটা অসাধ্য কাজ নয়। গত কালের ব্যর্থতার বেদনাকে প্রায় সম্পূর্ণ হটিয়ে দিয়েছে নতুন একটা প্রীতিকর অনুভূতি: মেহ্‌রিবান কাজে লাগতে শুরু করেছে এরিমধ্যে, এখানে তাকে এখন দরকার।

সন্ধ্যেবেলায় জাকির কারখানায় থাকে না সে জানত, তাই জানলার দিকে আর তাকায়নি। টেলিফোন কল অল্প কমে এলে মেহ্‌রিবান মেয়েদের কথাবার্তা কান পেতে শুনল। ওরা কিন্তু একবারও জাকিরের নাম করছে না।

বই থেকে মুহূর্তের জন্য মুখ তুলে জামিলিয়া জানাল:

'দরখাস্ত আর কাগজপত্তর পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'এবার কোথায় পাঠালে?' নাজিলা জিজ্ঞেস করল।

'মস্কোয় আবার, সাহিত্য ইনস্টিটিউটে।'

'কাজটা যেন হয়!'

কী একটা ভাবল জামিলিয়া, উত্তর দিল না। তারপর আবার বইতে মুখ গুঁজল।

হালকা একটা নিশ্বাস ফেলল মেহ্‌রিবান। "তার মানে ওর কিছু অঘটন ঘটেনি। ঘটলে এরাই সবচেয়ে আগে জানত, বাইরের পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার ফুলকি তো এখানেই আমাদের সুইচবোর্ডে জ্বলে ওঠে। তাহলে ও বেঁচে আছে, ভালো আছে। তাহলে এল না কেন? নিজেই তো আসার কথা

তোলে... আমাকে নিয়ে মস্করা করেনি তো? না না, জাকির কখনো তা করবে না, কখনো না!"

'তিন নং। কাকে চাই? আমাকে?' নিথর হয়ে গেল মেহ্‌রিবান। 'আমাকে কী দরকার? আপনি কে?'

উত্তেজনার ফলে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল।

জাকির। যেন ষড় করে সেসময় সুইচবোর্ডে ঘন ঘন আলো জ্বলতে লাগল, জাকিরের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়।

'একটু দাঁড়ান!' কলের উত্তর দ্রুত দিতে দিতে মেহ্‌রিবান টুকরো কথাটা যেন ছুঁড়ে দিল। জাকিরের সঙ্গে কথা বলার জন্য অন্য সমস্ত কলের উত্তর দিতে চেষ্টা করল যত তাড়াতাড়ি পারে।

'তিন নং। কথা বলুন! তিন নং... দিচ্ছি। উত্তর পাচ্ছি না। তিন নং।'

এত তাড়াতাড়ি আর কখনো কাজ করেনি মেহ্‌রিবান। ভেতরটা টান টান হয়ে উঠেছে, হাতদুটো সুইচবোর্ডে উড়ে চলেছে। চটপট চাবি টিপছে বা খুলছে। জাকিরকে লাইনে অপেক্ষায় রেখে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার সময় করে নিচ্ছে:

'হ্যাঁ, অনুগ্রহ করে... এক মিনিট! তিন নং! কথা বলুন! তিন নং! কথা বলুন। কী বললেন? ঠিক শুনতে পাচ্ছি না।'

দূর থেকে জাকিরের গলাটা ধরা-ধরা মনে হল।

'বলছি যে কাল একটা জরুরী কাজে আটকা পড়াতে আসতে

পারিনি। আপনাকে আগে থেকে জানাতে পারিনি। আপনি হয়ত আমার ওপর আবার খুব রেগেছেন?'

জাকির এখানে থাকলে মিথ্যা কথা বলতে তার সাহসে কুলোত না, কিন্তু টেলিফোনে ব্যাপারটা সহজ:

'আমি ওখানে যাইনি।'

কথাটা বলল কেন? নিজেকে জাকির দোষ না দেয়, সেই ইচ্ছে বুঝি? না, শুধু অহঙ্কার থেকে? যাই হোক, তার চরিত্রে নতুন একটা গুণের সাক্ষী এটা।

'সিফ্‌টের পর আপনার অপেক্ষায় থাকব?'

'দরকার নেই। অপেক্ষা করবেন না।'

'কেন?'

'এক মিনিট। তিন নং। দিচ্ছি... তিন নং।'

'আপনি চান না চান আমি আসছি।' গোঁ ধরল জাকির।

যাতে অন্যরা না শোনে সেজন্য অত্যন্ত অস্ফুটকণ্ঠে মেহ্‌রিবান বলল:

'না, আসবেন না। আসা চলবে না। তিন নং। এনগেজড্‌। আজ দেরি হয়ে গেছে। তিন নং।'

'দশ-পোনেরো মিনিটের জন্য!' জাকিরের গলায় অনুরোধের একটা একগুঁয়ে সুর।

আবার বলল মেহ্‌রিবান যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে:

'না, আসা চলবে না। দেরি হয়ে গিয়েছে! আপনি কাজে বাধা দিচ্ছেন,' শেষের কথাটি বলল যেমন করে বাচ্চাদের বলে।

'আপনার কি কোনো দয়ামায়া নেই!' জাকির এবার চটেছে।

মেহ্‌রিবানের মুখে হাসি ফুটল। আনন্দে চোখদুটো বুজে এল পর্যন্ত।

'চুপ করে আছেন কেন? উত্তর দিচ্ছেন না যে?'

'কাকে চাই? দিচ্ছি। তিন নং।'

প্রত্যাখ্যানে অভ্যস্ত নয় জাকির, সে যেন ফেটে পড়ল:

'আপনি আগেকার শোধ নিচ্ছেন বুঝি?'

'তিন নং। উত্তর দিচ্ছে না। তিন নং। দিচ্ছি! কথা বলুন!'

'উত্তর দিচ্ছেন না কেন? যা হয় কিছু একটা বলুন!'

মেহ্‌রিবান তখন সপ্তম স্বর্গে।

'তিন নং... তিন নং... তিন নং...'

'দাঁড়ান তাহলে, এখ্‌খুনি ট্যাক্সি চেপে আসছি কারখানায়!' শাসাল জাকির।

এবার মেহ্‌রিবান ভয় পেয়েছে।

'না, না, দরকার নেই! শুনুন, দরকার নেই! কাল রাতে আমার কাজ, তখন কথা বলব। এখন আসবেন না, দোহাই আপনার! কথা দিন যে আসবেন না!'

অসন্তুষ্টভাবে জাকির বিড়বিড় করে বলল:

'আচ্ছা...'

কৃতজ্ঞতায় মেহ্‌রিবানের চোখ চিকচিক করে উঠল।

'শুভরাত্রি!'

জামিলিয়াকে ডেকে মেহ্‌রিবান বলল তার জায়গা নিতে। আরাম করে সোফায় বসে প্রজাপতি-ব্রোচটা খুলে দেখতে লাগল তারিফ করে। পাকা কাজ সে পাওয়াতে মেয়েরা সবাই কত খুশি হয়েছে! সত্যি, জীবনটা বেশ, আর পৃথিবীতে ভালো লোকেরাই দলে ভারি! কারখানায় তাকে দুঃসহ অস্থির কয়েকটা মিনিটের মুখোমুখি হতে হয়েছে, তারপর সুখের প্রহর। আর জীবনে সুখের এই প্রথম ঝলকানি এসেছে তার নিজের শ্রমের ফলে। অবশ্য নতুন বান্ধবীরা তাকে অনেক সাহায্য করেছে এতে! আজ সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা, বন্ধুত্বপূর্ণ সানন্দ অভিনন্দন আর উপহার, জাকিরের সঙ্গে কথাবার্তা — সব মিলিয়ে এত শক্তি আর আত্মবিশ্বাস এনেছে মেহ্‌রিবানের মনে যে তার মুখের ভাব পর্যন্ত বদলে গেল। এ মুহূর্তে তাকে কেউ দেখলে লক্ষ্য করত যে, তার চোখের সেই বিষণ্ণতা ও অস্থিরতার জায়গায় এসেছে জাগ্রত একটা আনন্দ, সে যেন এতদিনে পেয়েছে বহুদিন খোঁজা মহার্ঘ একটি রত্ন; সেটিকে আশেপাশের দৃষ্টি থেকে সযত্নে লুকিয়ে রাখতে চায় সে, যেন অন্যরা ছিনিয়ে নেবে এই তার ভয়। হ্যাঁ, মেহ্‌রিবান এখন পুরোপুরি স্বাবলম্বী: নিজের কাজ তার, নিজের বাড়ি, জীবনে এসেছে নতুন অর্থ।

জাকির কেমনভাবে অনুনয় করেছে, জেদ ধরেছে, চটে উঠেছে! কাল আবার ফোন করবে হয়ত। তখন ইচ্ছে করেই

তাকে লাইনে অপেক্ষা করাবে মেহ্‌রিবান, যাতে আনন্দ ও উত্তেজনায় ভরা মিনিটগুলো দীর্ঘতর হয়।

হলও তাই। রাতের সিফ্‌টের সময় আবার ফোন করল জাকির। রাতের কাজে হয়ত অত তাড়া ছিল না, হয়ত কাজটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে তাই কথাবার্তা চলল আরো সহজে, আরো স্বচ্ছন্দে। মেহ্‌রিবানের জায়গাটা একেবারে পাশে, একদিকে কেউ নেই, সেজন্য তার সোয়াস্তি। তাছাড়া ইয়ারফোন থাকলে পাশের কথাবার্তা বলতে গেলে শোনে না মেয়েরা। অল্পস্বল্প কলের জবাব তাড়াতাড়ি দিয়ে জাকির কী বলে তার অপেক্ষায় সে রয়েছে। এবার তার গলাটা অত্যন্ত স্পষ্ট:

'আপনাকে বাধা দিচ্ছি না তো?'

'না... এখন খুব কম কল। এক মিনিট! তিন নং... ২ নং যন্ত্রাগার দিচ্ছি। তিন নং।'

'মেহ্‌রিবান...'

'কী?'

'কাল শেষের দিকে কী বলেছিলেন মনে আছে?'

'আমি বলেছিলাম: "শুভরাত্রি!"'

'আর আমি সারা রাত ঘুমোইনি।'

'কেন?'

'জানি না কেন।'

'কোথা থেকে কথা বলছেন?'

'বাড়ি থেকে।'

'আপনি কি একলা?'

'হ্যাঁ... ভয় পাবেন না, কাছাকাছি কেউ নেই। বাবা নিজের কামরায় ব্যস্ত... শুধু আমি... আর আপনি...'

'আমি তো ওখানে নেই।'

'মানে আপনার অনুভূতি অন্য রকম।'

কী বলবে ভেবে পেল না মেহ্‌রিবান। গলা নামিয়ে জাকির ব্যাখ্যা করে বলল:

'দুটোর একটা: হয় আপনি এখানে আমার সাথে নয় আমি ওখানে, আপনার সাথে।'

'এখানে তো আমার আশেপাশে শুধু আমাদের মেয়েরা।'

'কিন্তু একবার ভেবে দেখুন যে আপনার আশেপাশে কেউ নেই।'

সুইচবোর্ডে আলো জ্বলে উঠল। তাড়াতাড়ি উত্তর দিল মেহ্‌রিবান:

'তিন নং। জাহাজঘাট? দিচ্ছি। তিন নং। ডেসপ্যাচারকে দিচ্ছি। ল্যাবরেটরি? দিচ্ছি। তিন নং... তিন নং...'

আলোর সংখ্যা কমে এল আবার। তখন জাকিরকে বলল মেহ্‌রিবান:

'শুনছেন তো আমি এখন কোথায়? এই জাহাজঘাটে, তারপর শোধন যন্ত্রাগারে, তারপর আবার ল্যাবরেটরিতে — ফের ডেসপ্যাচ-ঘরে...'

'মনে হচ্ছে আপনি এখনো আমাকে মাপ করেননি,' আরম্ভ

করল জাকির, 'না, দাঁড়ান, বলতে দিন! আমি চাই না যে আপনি আমাকে খারাপ ভাবেন। যদি জানতেন আমাদের ডিপার্টে কী কাণ্ড তাহলে আমার ওপর চটতেন না। না, দাঁড়ান, আমার মনে যে সব কথা তোলপাড় করছে তা বলতে দিন। কী যেন বলছিলাম? হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমাদের এমন অতিষ্ঠ লাগে যে সামলে রাখা দায়, গালিগালাজ করতে হয়। এ পর্যন্ত কিন্তু নিজের রূঢ়তার জন্য কারো কাছে কখনো মাপ চাইনি — আপনিই প্রথম।'

'যদি মাপ চাওয়া আপনার স্বভাববিরুদ্ধ আমার কাছে চাইলেন কেন?'

'নিজেই ভেবেছি কথাটা। জানি না আপনার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে... আপনি হামেশা এত বিষণ্ণ কেন? কেউ যেন আপনাকে বরাবরের মতো ভয় পাইয়ে দিয়েছে। না, দাঁড়ান, যা ভাবি সবটা বলতে দিন। আমার ধারণা, আপনার সংসার খুব ভালো, বেশ ভালোভাবে থাকেন। টেলিফোনে কাজ নিলেন কেন? মাইনে তো খুব বেশি নয়। পড়াশুনো চালিয়ে গেলেন না কেন? না, মনে হচ্ছে, ঠিক বলছি না। আপনার কী একটা গোপন কথা আছে, সেটা আপনাকে যন্ত্রণা দেয়। সাহায্যের দরকার হলে আমি যা পারি সব করব। খুলে বলুন, লজ্জা করবেন না।' জাকির বেশ তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে, মন ঠিক করে ফেলে চটপট। এ মুহূর্তে যা বলল তার সবটায় আন্তরিক

বিশ্বাস তার। 'আপনার কোনো বিপদ আপদ হলে আপনার শান্তির জন্য আমি জান দিতে পারি!'

মেহ্‌রিবানের মনে হল সে মোহনিদ্রার ঘোরে আছে, তার একমাত্র বাসনা এ ঘুম যেন না ভাঙে। কথা বলার শক্তি নেই, চুপ করে রইল সে।

'আপনি চুপ করে আছেন কেন, মেহ্‌রিবান?'

'মন দিয়ে আপনার কথা শুনছি।'

'কিছু না কিছু বলুন?'

'বলবার কী আছে?'

'আপনার কী কষ্ট, বলুন। আপনার মনে কী ব্যথা?'

উত্তর দিল না মেহ্‌রিবান, শুধু চোখের পাতা কেঁপে উঠল আর আঙুলগুলো অস্থিরভাবে টান দিল স্কার্ফের খুঁটিতে।

'আচ্ছা, তাহলে আমিই জিজ্ঞেস করি, আপনি জবাব দিন,' প্রস্তাব করল জাকির। 'হয়ত আপনাকে কেউ ঠকিয়েছে?'

মেহ্‌রিবানের হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেল। প্রশ্নটা এত বিচ্ছিরি। কথার কী ছিরি: "হয়ত আপনাকে কেউ ঠকিয়েছে?" কী করে এটা জিজ্ঞেস করতে পারল জাকির? কী ভাবে সে, কিসের ইঙ্গিত সে দিচ্ছে?

টেলিফোনে উচ্চ কণ্ঠে সে চমকে উঠল। চেষ্টা করল অপ্রীতিকর অনুভূতিটা চাপবার। হয়ত এখন জাকিরের তারি মতো বিচলিত অবস্থা, কী বলা উচিত ভাবার ক্ষমতা নেই।

খুঁতখুঁতে হলে চলবে না। নিজেকে সামলে নিল মেহ্‌রিবান, সংযতভাবে কথা বলার সময় শুধু গলাটা একটু কাঁপা শোনাল:

'আমাকে এ-রকম প্রশ্ন আর করবেন না। বুঝেছেন?'

'মাপ করুন,' মনে হল জাকির অল্প হাসছে, 'হুম! দেখলেন তো, আবার আপনার কাছে ক্ষমা চাইলাম — এটা নিয়ে দুবার হল। আচ্ছা, তাহলে অন্য প্রশ্নের উত্তর দেবেন তো?'

একটু চুপ করে থেকে অভ্যাস মতো মৃদু কন্ঠে মেহ্‌রিবান বলল:

'জিজ্ঞেস করুন...'

'আপনার বাবা-মা আছেন তো?'

'বাবা আছেন।'

'আর মা?'

'মারা গেছেন।'

'অনেক দিন?'

'যেদিন জন্মাই সেদিন।'

'তার মানে... মানে আপনি মায়ের স্নেহ পাননি?'

মেহ্‌রিবান বলতে পারত যে বাপের স্নেহও তার অজানা, কিন্তু কিছু বলল না।

'আপনার বাবা কী করেন?'

'পাওয়ার-ইঞ্জিনিয়র।'

'আপনার বয়স কত? না, দাঁড়ান, বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছি, মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করে না।'

চুপ করে রইল মেহ্‌রিবান। কিন্তু জাকিরের এ বিষয়ে বেশ আগ্রহ।

'আপনার বয়স কত আমি বলব শুনবেন?'

'শুনতে চাই না!'

'কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন?'

'এখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছি।'

'অর্থাৎ আপনার বয়স বড়ো জোর চোদ্দ বা পোনেরো?'

'আপনি কী? যত খুকী ভাবছেন তত নই!'

'হুঁ। অদ্ভুত মেয়ে আপনি।'

'কেন?'

'কেন, সেটা বোঝানো আমার পক্ষেই মুশকিল।'

আবার যাতে খানায় পা না দেয় তাই জাকির এখন প্রত্যেকটা কথা বলছে ভেবেচিন্তে, থেমে থেমে। শুনে মেহ্‌রিবানের হাসি পেল, কারণটা সে আঁচ করতে পেরেছে। তার হৃদয় বুদ্ধির চেয়ে প্রখর।

'না, শুনুন। ধরুন আশ্চর্য ইনটেরেস্টিং একটা বই পেয়ে গেলেন, প্রথম পাতা থেকেই জমে গেছেন, হঠাৎ সবচেয়ে ইনটেরেস্টিং জায়গায় এসে দেখলেন পাতাগুলো নেই, ছেঁড়া, হয়ত খেলতে গিয়ে কোনো বাচ্চা ছিঁড়েছে বা কোনো দুষ্টুবুদ্ধি লোক। পরে কী আছে অজানা রইল, ভয়ানক খারাপ লাগে তখন। আপনাকে দেখে এ-রকম বই'এর কথা মনে হয়।'

মেহ্‌রিবানের ঠোঁটে কোমল হাসির ঝিলিক দেখা দিল।

'তার মানে, আপনি আমার জীবনের পাতাগুলো উলটোতে চান?'

'অত্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, বিশ্বেস করুন।'

আবার চুপ করল মেহ্‌রিবান। সে কী বলে তার অপেক্ষায় আছে জাকির। আচমকা মেহ্‌রিবান প্রশ্ন করল:

'আচ্ছা, বলুন তো... আপনি এ-রকম বই অনেক ঘেঁটেছেন?'

হেসে উঠল জাকির।

'আপনাকে যত সরল ভালোমানুষ ভেবেছিলাম ততটা নন দেখছি!'

'আমার কথার জবাব তো দিলেন না।'

'যদি বলি একটাও নয়, বিশ্বেস করবেন?'

অত্যন্ত আন্তরিকভাবে মেহ্‌রিবান মৃদু কণ্ঠে বলল:

'বিশ্বাস করি...'

'না, আপনি দেখছি সরল।'

'তার মানে অনেক বই ঘেঁটেছেন?'

'বিস্তর! না... ঠিক কী করে বলি... কোনো আনন্দ পাইনি, এমনি ঘেঁটেছি। এমন তো বই আছে যা মনে থাকে না, পড়ার পরই সব শেষ।'

'তিন নং... এক্ষুণি দেখছি। এনগেজ্‌ড্‌। না সবুর করবেন না, কিছুক্ষণ পরে আবার ফোন করবেন।'

'কী বললেন?'

'বলছি যে, এ-সব মেয়েদের জন্য আমার দুঃখু হয়।'

'দেখলেন তো, সত্যি কথা বলাটা সুবিধের নয়।'

'কেন?'

'কারণ আপনি এবার আমাকে ভয় পাবেন।'

'ভয়? কেন?'

'অনেক বই ঘেঁটেছি বলে।'

'আমার সঙ্গে সেটার সম্পর্ক কী?'

'প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, কেননা কাল সন্ধ্যেবেলায় আমাদের দেখা না হলে নয়।'

মেহ্‌রিবানের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। বাকশক্তি আবার উধাও হয়েছে। জাকির শুধাল:

'আমার সঙ্গে দেখা করতে হয়ত আপনি ডরাচ্ছেন?'

চুপ করে রইল মেহ্‌রিবান। জাকির এবার চটল।

'কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল আমরা দুজন দুজনকে বেশ ভালোভাবে চিনি, চিনি অনেক দিন। তাই রেখেঢেকে কোনো কথা বলিনি। ভেবেছিলাম, আপনিও খোলাখুলি ব্যবহার করবেন আমার সঙ্গে, কিছু ঢাকবেন না। কিন্তু দেখছি আমার কথাবার্তা আপনার কাছে বেখাপ্পা লাগে, আমার খোলাখুলিভাবে আপনি ভয় পান। অনেক বই পড়েছি কিনা যখন জানতে চাইলেন, আপনাকে সত্যি কথাটা বললাম। জানেন তো, আসামী মুক্তকণ্ঠে নিজের অপরাধ স্বীকার করলে তার শাস্তি লঘু হয়?'

'আপনার কী অপরাধ?'

'আপনাকে সত্যি কথা বলেছি, সেটা।'

'এটা বুঝি অপরাধ?'

'যদি কোনো অপরাধ না করে থাকতাম, আপনি অনেকক্ষণই মন ঠিক করে নিতেন।'

'ঠিক করা? কী ঠিক করা?'

'আমাদের দেখার বিষয়ে।'

মৃদু হাসল মেহ্‌রিবান।

'এটা ঠিক করার অধিকারটা বুঝি আমার?'

'সত্যি বলতে গেলে এখন আপনাকেই অপরাধী মনে হচ্ছে, দণ্ডটা আমাকেই ঠিক করতে হবে দেখছি।'

'কী অপরাধ আমার?'

'আপনি আমার ক্ষিধে আর ঘুম কেড়ে নিয়েছেন...'

হাসল মেহ্‌রিবান।

'আমাকে এবার কী করতে হবে?'

'শাস্তি মেনে নিতে হবে।'

'কী শাস্তি?'

'কাল সন্ধ্যে আটটার সময় "আজনেফ্‌ত"এর মোড়টায় হাজিরা দিতে হবে।'

'বেশ...'

আনন্দে অধীর হয়ে প্রায় চেঁচাল জাকির:

'মেহ্‌রিবান!'

উত্তরের পরিবর্তে টেলিফোনে শোনা গেল ঘন ঘন ঘণ্টার শব্দ।

দীপ্ত হয়ে উঠেছে মেহ্‌রিবান। পৃথিবী বা আকাশে তার আনন্দ রাখার ঠাঁই নেই। টেলিফোনে দু দিনের আলাপ দুবার মিলনের সামিল। তৃতীয় মিলন হবে কাল!

আবার আলো জ্বলে উঠতে লাগল।

'তিন নং! দিচ্ছি। তিন নং! কথা বলুন! তিন নং...'

৭

সখের পোষাকটা পরে মেহ্‌রিবান গোলাপপাশ থেকে কিছু জল হাতে নিয়ে গলায় আর রগে দিল।

এবার নিসাবেইমের সঙ্গে দেখা হল না, রাস্তায় বেরিয়ে হাঁফ ছাড়ল মেহ্‌রিবান। হৃদয় তার ছুটে চলেছে, কিন্তু তার চেষ্টা আস্তে হাঁটার। তৃতীয় মিলনে চলেছে সে, জাকিরের ভাষায় "শাস্তি মেনে নিতে"।

নিজেরি অজানতে তার গতি দ্রুততর হল। পাদুটো যেন মাটিতে পড়ছে না, হাঁটছে না মেহ্‌রিবান, উড়ে চলেছে। সহরের সব ঘড়ি যেন প্রতি কোণে ইচ্ছে করে দেখা দিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে: "তাড়াহুড়ো করো না, মেহ্‌রিবান, এখনো হাতে সময় আছে। ধৈর্য ধরো, মেহ্‌রিবান, একটু সংযত হও।"

প্রতিবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গতি কমিয়ে দিচ্ছে মেহ্‌রিবান। প্রতিবার আপনা থেকে চোখে পড়ছে নিচে

বিস্তারিত সহরের দিকে। খাঁজকাটা দেয়াল, গম্বুজওয়ালা প্রাচীন কেল্লাটির কঠোর সৌন্দর্য আর দূরে ছুঁচল মিনারগুলো তার বরাবর প্রিয়, ভালো লাগত আধুনিক যুগের নতুন চমৎকার বাড়ি আর চওড়া রাস্তা। বাবার সঙ্গে অন্য সহরে গেলেই প্রতিবার প্রথম দিন থেকেই নিজের সহরে ফেরার দিন অধৈর্যভাবে গুণত সে। ফিরে এসে মনে হত সহরটা প্রায় অচেনা, অল্প সময়ের মধ্যে কত বদলে গিয়েছে। ফেরার প্রথম দিনগুলিতে বাকুতে সে ঘুরে বেড়াত, এ মোড়ে ও মোড়ে থেমে অবাক হয়ে দেখত। "এটা সত্যি কার্ল মার্কস বাগান?" সচকিত হয়ে ভাবত — "এখানে তো ছোট্ট ছোট্ট বাড়ির দঙ্গল ছিল, আর এখন পার্ক, পার্কটা এত বড়ো যেন বাড়িগুলোকে গিলে ফেলেছে। শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পার্কটা নতুন বৌ'এর মতো সেজেছে! আর এ রাস্তাগুলোও দেখছি চওড়া হয়েছে!"

প্রতি বছর আরো সুন্দর হচ্ছে বাকু। চওড়া রাস্তায় গাছের সমারোহ বাড়ছে, দূরে কাস্পিয়ান সাগরের নীলাভ ঝিলিক। এখন পৃথিবীর যে কোনো সমুদ্রতীরের সহরের সঙ্গে সৌন্দর্য ও আয়তনে পাল্লা দিতে পারে বাকু। আর একটা কারণে বাকু আকর্ষণ করত মেহ্‌রিবানকে — সেটা হল তার বৈচিত্র্য। যে কোনো মোড় নিলে, যে কোনো দিকে ঘুরলেই নতুন একটা চেহারা চোখে পড়ে, তার নিজস্ব রূপ, তার পুনরাবৃত্তি নেই। কাস্পিয়ান সাগর তীরের পাথর আর পাহাড়ে বিস্তৃত নিজের এই অধীর মুখর জনবহুল সহরকে ভালোবাসে মেহ্‌রিবান।

বড়ো হয়ে উঠেছে বাকু, চলেছে গৃহনির্মাণ, চারিদিকে উদ্যত ক্রেনে পাথরের বোঝা তুলছে নতুন নতুন বাড়ির অসমাপ্ত দেয়ালে। দিগন্তে অস্তগামী সূর্যের সোনালি রেখা আঁকা সন্ধ্যাকাশের পটভূমিতে ক্রেনগুলির লাল আলো পথে তীর এঁকেছে, যেন পড়ন্ত তারা। ক্রেনের কাজ দেখতে দেখতে মাথা থেকে স্কার্ফ খুলে গেল, সমুদ্রের হাওয়া কানের কাছে বেণী সরিয়ে ফিসফিসিয়ে জানাল, সাক্ষাতের সময় হয়েছে। চমকে উঠে মেহ্‌রিবান রাস্তা ধরে নিচের দিকে ছুটল, ছুটল সমুদ্রের দিকে।

ফিকে ছাই রঙের প্যাণ্ট আর খয়েরি রঙের কোট পরেছে জাকির। মেহ্‌রিবানকে দেখেই চিনতে পারেনি। সাদাসিধে বাদামি পোষাক পরনে স্কুলের মেয়ের মতো দেখতে সেই পাণ্ডুর ক্লান্ত রুগ্ন মেহ্‌রিবান আর নেই, তার জায়গায় জাকিরের দিকে দ্রুত পায়ে আসছে একটি সুন্দর ডাগর মেয়ে, তার ছোট্ট বুক জালে-পড়া মাছের মতো স্পন্দমান। জাকির মুগ্ধ, মনে হল সারা পৃথিবীতে এর চেয়ে মধুর মেয়ে থাকতে পারে না। আর জাকিরের বিষয়ে কথাটা তো বহুদিন মনে হয়েছে মেহ্‌রিবানের। শুধু এ মুহূর্তটিতে অনুভূতি আর বাসনার দ্বন্দ্ব জাকিরের মনে দেখা দিল, যে দ্বন্দ্বের স্বাদ মেহ্‌রিবান পায় আগে।

লজ্জা কেটে গিয়েছে মেহ্‌রিবানের, চোখের সেই ভীত চকিত ভাব আর নেই। দীপ্ত হয়ে উঠেছে মেহ্‌রিবান।

'মেহ্‌রিবান!'

'নমস্কার ...'

মুহূর্তখানেক দুজনেই নিথর, মন্ত্রমুগ্ধের মতো। দুজন দুজনের চোখে তাকিয়ে রইল অপলকে, আর সে-সময় লোকজন, গাড়ি, রাস্তা আর ঘরবাড়ি, আশেপাশের সবকিছু সরে গেল দূরে কোথায়।

প্রথমে মেহ্‌রিবান জেগে উঠল। এগিয়ে গেল কয়েক পা সমুদ্রের দিকে।

বুলেভারের নতুন ভাগটা, যেটা বাইলভের দিকে গিয়েছে, ছবির মতো। নবীন পাইনগাছের বীথিটায় আরো ঠাণ্ডা, সেখানে একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে দুজনে দাঁড়াল। একটা বেঞ্চি দেখিয়ে জাকির বলল:

'এখানে বসা যাক।'

মেহ্‌রিবান মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানাল, এগিয়ে চলল দুজন। বেঞ্চিগুলোর একেবারে শেষে এসে তারা দাঁড়াল। বেঞ্চিটার উপরে নবীন উইলোগাছ ঝুঁকে পড়েছে, ছাতার মতো, দিনের বেলায় রোদ থেকে আড়াল করে লোককে, সন্ধ্যেবেলায় চাঁদের বেয়াড়া আলো থেকে।

'এ জায়গাটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে…'

'তাহলে এ বেঞ্চিটা আমাদের হয়ে যাক বরাবরের জন্য, কেমন?'

চুপচাপ দুজনে বসল।

তৈলকর্মীদের সাঁতার-ঘাঁটির বাঁ দিকের জাহাজ থেকে গান ভেসে আসছে: নাচের রেকর্ড বাজানো হচ্ছে, ফুর্তি করছে

নাবিকেরা। বেড়াতে যারা এসেছে তারা সেদিকটায় চলে যাচ্ছে, এদের দুজনের বেঞ্চিটার চারিদিকে চুপচাপ, জনশূন্য।

পাল-তোলা জাহাজ থেকে ভেসে আসছে "কালো চুল" গান। পুরুষের গলা মাঝে মাঝে মিলে যাচ্ছে নাচিয়েদের পায়ের শব্দের সঙ্গে, মাঝে মাঝে আলাদাভাবে ধ্বনিত হচ্ছে। দুজনের সামনে তীরের পাথর-প্যারাপেট পেরিয়ে নোঙর বাঁধা নৌকোগুলো দুলছে, জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তীরে বসা মানুষদের যেন ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

'মেহ্‌রিবান, আপনাকে আমার কত কথা বলা দরকার। কিন্তু সে-সব কথা টেলিফোনেও বলা চলে। এবার থেকে আপনার যখন সন্ধ্যেবেলায় বা রাতে কাজ তখন আমি থাকব আপনার কাছে, টেলিফোন আমাদের মেলাবে। এখানে বসে মুখোমুখি যা বলতে পারব না তা টেলিফোনে আমরা খুলে বলব।'

শিশুর মতো নির্ভাবনায় হেসে উঠল মেহ্‌রিবান, জাকিরের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল:

'আর এখন? এখন কী করব আমরা?'

সরল সহজ প্রশ্নে জাকির থতমত খেয়ে গেল। মেয়েটির সান্নিধ্য তখুনি তার চিন্তাধারাকে ঝাপসা করে দিয়েছে, তাকে দেখে তার যে অনুভূতি ও ভাব তা ভাষায় রূপ দেওয়া অসম্ভব।

'সোনার মাছের রূপকথা আপনার মনে আছে?' আচমকা সে জিজ্ঞেস করল।

'মনে আছে।'

'সত্যি এখ্‌খুনি তেমনতর মাছ হয়ে আপনি যা চান তাই করার কী ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে! আপনি একটা কিছু ছুঁড়ে দিন সমুদ্রে, আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে তল থেকে তুলে আনি।'

'তাতে কী লাভ?'

'নিজেই জানি না কেন, ভাষায় বলতে পারব না। আপনি আমাকে এখনো কতটুকু চেনেন...'

'অনেকদিন আমি তোমাকে চিনি, জাকির... অনেক অনেক দিন!'

নিজের কানকে বিশ্বাস হল না জাকিরের।

'আপনি আমাকে "তুমি" বলে ডাকলেন?'

কিছু বলল না মেহ্‌রিবান, মুখে শুধু হালকা হাসি ফুটে উঠল।

'ঠিক বলুন তো? আপনি সত্যি বলেছেন না আমি শুধু কল্পনা করেছি?' অবাক হয়ে আবার শুধাল জাকির। 'আর একবার বলুন তো?'

'এতে অসাধারণ কী আছে? তুমি...'

অন্তরের সঙ্গে সহজে উচ্চারিত একটি শব্দে সোনার মাছ, সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদি বাগাড়ম্বর হাস্যকর ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল। জাকিরের এবার খেয়াল হল যে মেয়েটির সঙ্গে খাঁটি সুরে সে কথা বলেনি, এর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলা চলবে না। মেয়েটির চোখে সে স্থির দৃষ্টিতে চাইল। এবার অন্যভাবে দেখল তাকে। নিজের মুখ থেকে টান-টান

ভাবটা চলে গেল, তার জায়গায় এল স্থির, প্রায় কঠোর একটা ভাব। না, চটুল স্বভাবের মেয়ে নয় মেহ্‌রিবান! ও জাতের মেয়ের সঙ্গে এর কোনো আদল নেই। তাহলে ব্যাপারটা কী? ওর শক্তির উৎসটা কী? সেই শক্তি যার ফলে একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত কথায় — "তুমি" কথাটায় দুজনের মধ্যকার সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান খসে পড়ল। আর কথাটি কী ভাবে উচ্চারিত হয়েছে! পরিষ্কার শুচি চোখে তাকিয়ে, সহজে ও সাহসভরে উচ্চারণ করেছে। একটি মাত্র কথায় মেহ্‌রিবান যেন জানিয়েছে যে তাকেও তার মতো শুদ্ধ ও আন্তরিক হতে হবে।

সে কি তা হতে পারবে না?

"মেহ্‌রিবান, আমার মেহ্‌রিবান! আমার আদরের আপনার জন!" মনে মনে উচ্ছ্বসিতভাবে বলল জাকির। আর লোকে মনে মনে যা বলে তা সর্বদা আন্তরিক।

মেহ্‌রিবানের প্রস্তাব গ্রহণ করল জাকির। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল মেহ্‌রিবানের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবে চলবে, লুকোচুরি থাকবে না কিছু। ওর বিশ্বাসের যোগ্য সে, ইচ্ছে হল সেটা দেখায়। ভাষায় বলার শক্তি তার নেই, কথার বদলে হঠাৎ মেহ্‌রিবানকে জড়িয়ে কাছে টেনে আনল জাকির কোমলভাবে। তাকে চুম্বন করল না কিন্তু। শুধু হাত বুলিয়ে দিল তার চুলে, গলায়, কাঁধে, হাতে, যেন বিশ্বাস করতে চায় যে মেহ্‌রিবান জীবন্ত, বাস্তব, সত্যি তার অস্তিত্ব আছে, সে স্বপ্ন নয়। হ্যাঁ, ও জীবন্ত, সত্যিকারের মেয়ে। ওর হৃৎপিণ্ডের উষ্ণ স্পন্দন জাকির

অনুভব করল নিজের বুকে। ওর নিশ্বাস উষ্ণ তাজা, সে নিশ্বাস পড়ছে তার গালে। ওর চুল আর ঈষৎ ভিজে গলা থেকে গোলাপের মৃদু গন্ধ ছড়িয়েছে, সে গন্ধ মাতাল করে দেয়...

জাকিরের মনে হল পরম উচ্ছ্বাসের এ পর্ব শেষ হবে না, মনে হল ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এভাবে বসে মেহ্‌রিবানকে আদর করতে পারে, ওর বুকের ক্ষীণ সঙ্গীত শুনতে শুনতে দোলাতে পারে তাকে। গভীর সে মোহ; জাকিরের মনে হল সে এখন সম্পূর্ণভাবে মেয়েটির ক্ষমতাধীন। এত কাছাকাছি দুজনে বসে আছে, জাকির আলিঙ্গন করেছে মেহ্‌রিবানকে, তার শরীরের উত্তাপ আর নিশ্বাসের সুরভি অনুভব করছে সে, তবু দুজনের মধ্যে সর্বক্ষণ কী যেন একটা ব্যবধান রয়ে গেল।

হয়ত প্রথমে তাকে "তুমি" ডেকে মেহ্‌রিবান ধরে নিয়েছে যে জাকির দুজনের অনুভূতির শুদ্ধতা রক্ষা করে চলবে। যেন জাকিরকে সে বলেছে: "আমি তোমার শুদ্ধতায় বিশ্বাস করি, তোমার উচ্ছ্বাসের শুদ্ধতায় বিশ্বাস আছে আমার!"

কিন্তু পরের মুহূর্তে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল।

মেহ্‌রিবানের কাঁধে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল জাকির, পাতলা সিলকের পোষাকে টান পড়াতে যে-জায়গাটা এই সেদিন মেহ্‌রিবান রিপু করেছে সেটা ফেঁসে গেল, দেহের স্পর্শ লাগল হাতে... আবেগে ঝাপসা হয়ে গেল জাকিরের চোখ। চোখে স্রোতস্বিনীকে না দেখে তৃষ্ণা মেটাবার জন্য অন্ধ লোক যেমন ব্যাকুলভাবে খোঁজে হাত দিয়ে, ঠিক তেমনি পাগল হয়ে

জাকির উষ্ণ ঠোঁটে মেহ্‌রিবানের কম্পিত ঠোঁট খুঁজে পেয়ে তাতে বাঁধা পড়ল। কিন্তু স্রোতস্বিনীর জল আগুনের হলকার মতো, তৃষ্ণা মিটল না, শুধু বেড়ে গেল। জাকিরের চুম্বনে হাঁফ ধরে গিয়েছে মেহ্‌রিবানের। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু জাকির ছাড়ল না। হঠাৎ জাকির ঠোঁটে পেল নোনতা জলের স্বাদ। তক্ষুণি মেহ্‌রিবানকে ছেড়ে দিয়ে দুহাতে তার মুখ ধরে হতভম্ব হয়ে তাকাল। মেহ্‌রিবান কাঁদছে।

বড়ো বড়ো ঘন ঘন ফোঁটা গাল বেয়ে নামছে, সে উষ্ণ ধারায় সুখের আলো নিভে যাচ্ছে।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি! তোমাকে ভালোবাসি!' ধরা গলায় বলল জাকির।

কান্নায় ফেটে পড়ে মেহ্‌রিবান তার বুকে মুখ গুঁজল।

জাহাজে গানবাজনা থেমে গিয়েছে। তীরে স্তব্ধতা। মোটরের গতি কমিয়ে কয়েকটা জাহাজ নিঃশব্দে এল তীরের দিকে ছায়ামূর্তির মতো। সামনের সবুজ আলো জলে অস্থির রেখা আঁকছে। মনে হল দশ দিক রুদ্ধশ্বাসে কী যেন কান পেতে শুনছে। রাত্রির গভীর স্তব্ধতায় শুধু মেহ্‌রিবানের মৃদু ফোঁপানির আওয়াজ। তারপর চুপ করে সোজা হয়ে বসে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সমুদ্রে, যেখানে বয়ার রঙীন আলো ছোট্ট ছোট্ট সঙ্কেতে দপদপ করছে।

সে কি সুখী? না, মুহূর্তখানেক আগে সুখী ছিল না। এখন আবার তার বিশ্বাস হল যে সে সুখী।

'আলোগুলো সবসময় দপদপ করে কেন?' কী যেন ভাবতে ভাবতে সেদিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেহ্‌রিবান।

সেদিকে তাকিয়ে দেখল জাকির।

'ওগুলোকে নাবিকেরা বয়া বলে। যেখানে অগভীর আর যেখানে জলের নিচে পাথর সেখানে এগুলোকে রাখে। বিপদের বিষয়ে জাহাজকে হুঁশিয়ারি জানায়।'

"আমাদের বেঞ্চির কাছে ও-রকম একটা বয়া থাকলে বেশ হত," ভাবল মেহ্‌রিবান।

কিন্তু মেহ্‌রিবান নিজেই তো ভাবে জাকির বাতাস হলে সে হবে মেঘ, তার নিশ্বাসে ফুলের মতো ফুটে উঠবে, সমুদ্রের মতো উতলা হবে যদি জাকির ঝড় হয়?

"না, আমি কখনো তোমাকে কষ্ট দেব না, কখনো না, যা কিছু করো আমি এতটুকু বাধা দেব না! এইমাত্র যা করলে তা হয়ত দরকার, সর্বদাই হয়ত এ-রকমটা হয় — আমি তো জানি না, কী ভাবে এ জিনিসের শুরু হয়," ভাবল মেহ্‌রিবান, তারপর ফিরে তাকাল জাকিরের দিকে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে জাকির, তার মুখে ব্যথা ও অল্প দোষের একটা ছাপ। মেহ্‌রিবান হঠাৎ তার গলা জড়িয়ে ধরল ঘনিষ্ঠভাবে।

অপ্রত্যাশিত এই আবেগে জাকির অসম্ভব সুখী হল, জীবনে এত সুখী সে কখনো হয়নি।

'মেহ্‌রিবান! আমি তোমায় ভালোবাসি!' গলা তার ভেঙে গিয়েছে। সাবধানে মেহ্‌রিবানের বুকে সে মাথা রাখল।

তার নরম কোঁকড়া চুলে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল মেহ্‌রিবান। সমুদ্রের অন্ধকার বুকে তাকিয়ে রইল সে, যেখানে বয়ার আলো ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠে যেন বলছে, "সাবধান! সাবধান!" আর সে আলোর ফুলকি প্রতিফলিত হল তার আয়ত নিস্পন্দ চোখে...

৮

নতুন জীবন শুরু হল মেহ্‌রিবানের।

প্রতি সন্ধ্যায় দেখা হয় জাকিরের সঙ্গে, যেদিন সন্ধ্যা বা রাতের সিফ্‌ট থাকে না। দেখা হয় সমুদ্রতীরে, সেই তাদের প্রিয় বেঞ্চিটায়। যেদিন দেখা হয় না, অত্যন্ত খারাপ লাগে জাকিরের। এত ব্যাকুল লাগে যে পরের দিন মেহ্‌রিবানের কাছে যেতে যেতে মনে হয় এই প্রথম যাচ্ছে। মেহ্‌রিবানের যখন কাজ তখন দুজনের অনর্গল গল্প চলে টেলিফোনে। রাজ্যের গল্প, মাথায় যা আসে তাই, নিমেষের চিন্তা, অনুভূতির ছোট্ট একটা আভাস তক্ষুণি দুজনের দুজনকে বলা চাই।

দুজনের ভালোবাসা জন্ম নিল এখানে, তৈল শোধনাগারের বিরাট যন্ত্রাগারের মধ্যে, চুল্লির গুরুগুরু আওয়াজ আর পাম্পের ফোঁসফোঁসানির মধ্যে, ছোট্ট চাপা কামরাটায় যেখানে সুইচবোর্ডের আলো এবং মেয়েদের হাতের অবিশ্রাম নড়াচড়ায় শক্তিশালী কারখানাটির হৃৎস্পন্দন মূর্ত হয়ে ওঠে।

'তিন নং।'

'মেহ্‌রিবান!'

'দাঁড়াও! তিন নং!'

'মেহ্‌রিবান!'

'যন্ত্রচালকদের কামরা দিচ্ছি।'

'মেহ্‌রিবান! তোমায় ভালোবাসি!'

'তিন নং। মাপযন্ত্রের কামরা দিচ্ছি। জাকির! তুমি আমাকে পাগল করে দিচ্ছ। জানি, আমিও... তিন নং। এক নং যন্ত্রাগার দিচ্ছি। কথা বলুন! জাকির, তুমি কাজে বাধা দিচ্ছ। থাক, ওভাবে কথা বলার দরকার নেই... দাঁড়াও!..'

দুজনে দুজনের উপর রাগ করে, ঝগড়া লাগে লাগে, সঙ্গে সঙ্গে ভাব হয়ে যায়, আবার কথা চলে, বলে কিসে তাদের অন্তর পরিপূর্ণ, যে সব জিনিস তাদের কাছে অসাধারণ তার কথা বলে, দুজনে দুজনকে যে ভালোবাসে তার কথাও; মনে থাকে না যে এ সমস্ত কথা গত মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বলা হয়েছে কয়েক বার; তারপর আবার কথা কাটাকাটি, যাতে সঙ্গে সঙ্গে ভাব হয়।

জাকিরের সঙ্গে দেখা হলে মেহ্‌রিবান প্রায়ই নিজের অতীত দিনের গল্প করে। যা মনে আনতে ভালো লাগে না, তাও আবার স্মৃতিপটে ফিরিয়ে আনে। স্মৃতির এই সকল টুকরো ক্রমে ক্রমে মেহ্‌রিবানের শৈশবের একটা ছবি আনল জাকিরের সামনে, যে শৈশব কেটেছে ইঞ্জিনের বাঁশি আর চাকার

খটখটানির ঘুমপাড়ানি গানে। জাকিরকে সে ভাগ দেয় লেনিনগ্রাদের বিষয়ে তার ধারণার, বলে কী ভাবে চোখের সামনে খার্কভ নতুন করে গড়ে উঠেছে বেড়েছে, রিগার চেহারা কেমন।

জাকির শোনে। মেহ্‌রিবানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে, মাঝে মাঝে মধুর হাসিতে যে মুখ উদ্ভাসিত।

'জানো, একবার লেনিনগ্রাদে ডুবে মরতে চেয়েছিলাম,' মৃদু হেসে বলল মেহ্‌রিবান। 'ফনতান্‌কার কাছে গিয়ে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, ওটা পেরিয়ে কী করে জলে ঝাঁপ দিই। কিন্তু জলটা এত নোংরা যে ঘেন্না হল, গেলাম নেভার দিকে। রাস্তায় ছোট্ট একটা স্কোয়ারের মোড়ে আমাকে ডাকল একটি স্ত্রীলোক। বাচ্চা মেয়ে নিয়ে বেঞ্চিতে তিনি বসেছিলেন। বাচ্চাটা এত রোগা যে দেখলে কষ্ট হয়, কিন্তু দুজনেরি জামাকাপড় খুব ভালো। প্রথমে বুঝিনি যে আমাকে ডাকছেন, তাই থামিনি। তখন তিনি আবার ডেকে বললেন: "ও মেয়ে, একবার এদিকে এস তো!" কাছে গেলাম। "একটুখানি বোসো না আমাদের কাছে।" বসলাম। বসলে কোনো ক্ষতি নেই।

'ঠাণ্ডা মাংসের স্যাণ্ডউইচ ঝুলি থেকে বের করে মহিলাটি আমাকে খেতে বললেন। ভয়ানক রাগ হল, বললাম আমি পথের ভিখিরি নই। তিনি আদরের হাসি হেসে বললেন: "তা জানি। চটো না, স্যাণ্ডউইচটা খাও, তোমাকে খেতে দেখে হয়ত আমার নাতাশাও খাবে। মেয়েটা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, কিছুতেই খাওয়াতে পারছি না, কিন্তু অন্য লোকে খেলে মাঝে

মাঝে কাজ দেয়।" আর কিছু না বলে খেতে শুরু করলাম। চোখ বড়ো বড়ো করে বাচ্চাটা দেখতে লাগল কেমন আগ্রহে আমি খাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত তার গোঁ আর রইল না, মাকে বলল তাকেও দিতে। আমার আর নেভাতে যাওয়া হল না, রয়ে গেলাম ওদের সঙ্গে, অনেকক্ষণ খেললাম মেয়েটির সঙ্গে, ওরা না ওঠা পর্যন্ত। মহিলাটি বললেন, আমি যদি রোজ স্কোয়ারে এসে বাচ্চাটার সঙ্গে খেলি। রাজী হয়ে গেলাম।'

'ডুবে মরতে চেয়েছিলে কেন?' বিস্মিতভাবে শুধাল জাকির।

'বাবা পরপর তিন দিন বাড়ি ফেরেননি, আমার এত আতঙ্ক আর অস্থির লাগছিল যে বাঁচার শখ ছিল না। তাছাড়া মুখে দেবার মতো ছিটেফোঁটা ছিল না, সাংঘাতিক ক্ষিধে পেত।'

'তারপর কী হল?'

'নাতাশার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। তখনো রুশী ভালো বলতে পারতাম না, নাতাশার মা শুধরে দিতেন। একদিন স্কোয়ারে এসে দেখলাম নাতাশা আসেনি, শুধু তার মা এসেছেন। শুনলাম নাতাশার অসুখ হয়েছে, কান্নাকাটি করছে, আমাকে ডাকছে। সে-থেকে ওদের ওখানে আমার যাতায়াত শুরু। ওঁরা থাকতেন বেশ ভালোভাবে। নাতাশার বাবা কী একটা ইনস্টিটিউটে পড়াতেন, মাও কাজ করতেন, তবে বাড়িতে — জার্মান থেকে অনুবাদ করতেন। নাতাশা আর আমাকে প্রায়ই তিনি চমৎকার চমৎকার রূপকথা পড়ে শোনাতেন। একবার

তিনি "দুইমভচ্কা" কাহিনীটি পড়ে শোনালেন। গল্প শেষ হবার পর নাতাশা আমাকে দেখিয়ে আধো-আধো গলায় "মেরি-দুইমভচ্কা" বলে হাসতে লাগল। ও আমাকে মেরি বলে ডাকত। তারপর আমরা লেনিনগ্রাদ ছেড়ে চলে এলাম। নাতাশা আর তার মা আমাকে ছেড়ে দিতে এসে কাঁদলেন।'

'তোমার বাবা রাতে বাড়ি ফিরতেন না কেন?'

'জানি না। সেসময় খুব মদ খেতেন।'

জাকির তাকে বলিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরল, যেন তাকে আশ্রয় দিতে চায়, কী জানি কী থেকে বাঁচাতে চায়। আঙুরলতার মতো মেহ্রিবান তার গায়ে এলিয়ে পড়ল। আঠারো বছর বয়সের এই ক্ষুদে মেয়েটির শ্বাসপ্রশ্বাস মাতাল করে দিল জাকিরকে ফুলের গন্ধের মতো। দুজনে এভাবে বসে রইল পুরো এক ঘণ্টা, কোনো কথা নেই, দুজন দুজনকে কোমলভাবে আদর করল।

প্রতিবার দেখা হয়, আর মেহ্রিবানের প্রতি জাকিরের টান আরো বাড়ে, আরো বেশি করে নিজেকে সে সমর্পণ করে তার মধুর শুদ্ধতায়, জাকিরের প্রেমগ্রহণে তার শিশুসুলভ আনন্দে, মেহ্রিবানের শৈশবের সেই গল্প শুনে যে শান্ত বিষাদ তার মনে জাগে তার হাতে। জাকির নিজের কথা বেশি বলে না। তার জীবন তো চলেছে সফলভাবে, এত বৈচিত্র্য নেই তাতে।

'জানো জাকির, আমার মা আছেন, তবে সৎমা। একবার বাকুতে ফিরেছি...'

'তোমরা হামেশা এত ঘুরতে কেন?' জিজ্ঞেস করল জাকির।

'আমার মনে হয় বাবা ভয়ানক ঝগড়ুটে লোক ছিলেন। কোথাও বেশি দিন কাজ করতে পারতেন না। তখন বুঝতাম না কেন, এখন মনে হয় এর কারণ তাঁর স্বভাব। এমন কি নিজের মার সঙ্গেও তাঁর বনত না, কিছু একটা নিয়ে নিরন্তর দুজনের ঝগড়া লেগে থাকত। আমার মনে হয়, বাবা সর্বদা কী একটা খুঁজতেন, একটা জায়গায় সেটা না পেয়ে ভাবতেন অন্যখানে নিশ্চয়ই মিলবে, তাই খালি সহর বদলাতেন।'

'অসুখী লোক!'

'ওঁর জন্য আমারো খুব দুঃখু হয়।'

'তিনি তো তোমার জীবনটা ছারখার করে দিয়েছেন!'

'না, না, উনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

'কেন, আমি?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মেহ্‌রিবান।

'না, শোনো, আরো বলি। একবার বাকুতে আমরা আবার ফিরেছি। বাবা বছরখানেক কাজে টিকে রইলেন। বাবার আবার বিয়ে করা দরকার, এ প্রসঙ্গ উঠলেই বাবা ঠাকুমাকে এমন কথা বলতেন যেন আমি ওঁর বাধা, লেজুড়ের মতো এ সহর ও সহরে আমাকে নিয়ে গিয়ে তিনি হয়রান। ঠাকুমা বলতেন: "নিজের বাড়িতে বসে থাকলে মেয়েটা তোকে বাধা দিত না!" মনে আছে

তিনি আরো বলতেন: "যেমন কর্ম তেমন ফল। জানি না কী পাপ করেছি যে আল্লা আমাকে রোগে ভুগিয়ে সাজা দিচ্ছেন। রোগে আমি শয্যাশায়ী, দিনের পর দিন শরীর ভেঙে যাচ্ছে, আমার সেবাযত্ন দরকার, শুধু এইটুকু জানি। আর আমার মতো অসুস্থ অসহায় লোককে তুই যে ঝেড়ে ফেলেছিস শুধু তা নয়, সহরে সহরে চর্কি দিস, বাড়িতে থাকিস না; এতেও তুই খুশি নস, এখন চাস কচি মেয়েটাকে আমার ঘাড়ে চাপাতে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া। নিজে ভুগে ভুগে হয়রান, তাব ওপর আবার বেচারিটার জন্য ধকল সইতে হবে।" একদিন বাবা একটি মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে আমাকে বললেন: "এ হল তোর মা।" একমাস পরে আমরা তিনজন রিগায় গেলাম, আবার স্কুল ছেড়ে দিতে হল।'

মৃদু হাসি দেখা দিল মেহ্‌রিবানের মুখে।

'রিগা বাকু বা লেনিনগ্রাদের মতন নয় একেবারে। ভাবতে পারো, রিগায় আমি তিনবার হারিয়ে যাই! ওখানকার রাস্তাগুলো দেখতে একরকম, খুব পরিষ্কার, সমান, না আছে পাহাড় না আছে পাহাড়তলি। ঘরবাড়িগুলোও একরকম দেখতে, পরিষ্কার, সুন্দর, প্রায় সমান উঁচু — পাঁচ ছ'তলা। রাস্তা খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। আমার সৎমা তামারাও কাজে যেতেন। বাড়িতে একলা থাকতে ইচ্ছে করত না আমার। বিরক্ত হয়ে বেড়াতে বেরোলাম, দুতিনটে মোড় নিয়েছি, রাস্তা গেল হারিয়ে।

কিন্তু ভয় পাইনি, কাঁদিনি। বরং বাড়ি ফেরার রাস্তা জানি না বলে যেন খুশি লাগল। আসলে ওঁরা আমাকে দেখাশোনা করতেন না ঠিকমতো, বুঝেছ? ছোট্ট স্কোয়ারের একটা জায়গায় বসে — রিগায় তো ছোট্ট স্কোয়ারের ছড়াছড়ি — দেখতে লাগলাম পায়রাগুলো কেমন বুক ফুলিয়ে হেঁটে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আমি অনেকক্ষণ একলা বসে আছি দেখে পাশের বেঞ্চির একটি বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোথায় থাকি, বাড়ি ফিরছি না কেন। ব্যাপারটা বুঝে ওঁরা আমাকে আমাদের রাস্তায় নিয়ে এলেন। অবশ্য ওঁদের সঙ্গে কথা বলাটা বেশ শক্ত ছিল, কেননা ওঁদের রুশী আমার চেয়েও খারাপ। তারপর ক্রমে ক্রমে এক চেহারার রাস্তাগুলো চিনতে শিখলাম, ওদের নাম জানলাম। বাকুর মতো রিগাতেও কিরভ পার্ক আছে... আর আছে "১৩ই জানুয়ারি" নামের রাস্তা — এদিন পুলিশ বিপ্লবী মিছিলের ওপর গুলি চালায়, অনেকে মারা যায়। ওখানে রাস্তাগুলোর নাম বেশ ইনটেরেস্টিং, বিশেষ করে পুরোনো সহরে। লোকে বলে নামগুলো বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। যেমন, অনেক রাস্তার নাম ব্যবসা হিসেবে — আল্দারু স্ট্রীট, অর্থাৎ ভাঁটিওয়ালাদের রাস্তা, কালেয়ু স্ট্রীট — কামারদের রাস্তা। কয়েকটা নাম রুশী শব্দের কথা মনে করিয়ে দেয় — মিয়েসনিকু স্ট্রীট — মাংসওয়ালাদের রাস্তা, বা দ্জিরনাভু — মেলনিচ্নায়া স্ট্রীট। জানো তো, রুশী শব্দ "জেরনভা" — অর্থাৎ যাঁতিপাথর? তাছাড়া লাতভিয়ার বিপ্লবীদের নামে রাস্তা আছে।

যেমন পিওতর স্তুচকা স্ট্রীট। ভিয়েস্তুর পার্ক আছে, ইনি ছিলেন লাতভিয়ার একটি উপজাতির নেতা, ওখানে কোনো এক কালে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জার্মান নাইটদের ধ্বংস করেন। রিগা খুব সুন্দর সহর। সকালবেলায় বাবা আর তামারা কাজে চলে গেলেই ঘর বন্ধ করে আমি ছুটতাম রাস্তায় বা দাউগাভা নদীর ধারে। অনেক অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকতাম সেই দিকে যেখানে ছুঁচলো মাথাওয়ালা বাড়ি আর সরুচূড়া গির্জাসুদ্ধ প্রায় গোটা সহরটা চোখে পড়ে, এত পরিষ্কার নিখুঁতভাবে আঁকা যেন একটা অখণ্ড ছবি। আমার বরাবর মনে হত যে আশ্চর্য সহরটা কেউ গড়েনি, নিজে থেকে মাথা তুলেছে রূপকথার মতো, অন্য রকম হতে পারে না, অন্যভাবে ভাবাটাও অনুচিত। সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম কেমন করে পুরো সহরটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ফিকে নীল আকাশে, ওপরে গোলগোল পশমী মেঘ ভেসে চলেছে, ওরকম মেঘ আমাদের এখানে হয় না। আমার মনে হত গোটা সহরটা আমার, একান্ত আমার, সহরে আমি শুধু থাকি, যেখানে খুশি যেতে পারি, বাধা দিতে পারবে না কেউ। তখনকার মতো সত্যি তাই ছিল...'

গল্পে বাধা দিয়ে জাকির অনুরাগ ভরে কাছে টেনে নিত মেহ্‌রিবানকে, হাতের তলায় ছোঁয়া লাগত তার নরম কাঁধের।

৯

একবার জাকিরের নরম সিল্কমসৃণ চুলে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করল মেহ্রিবান:

'জাকির, কারখানায় টেলিফোনে অনেক কথা শুনি আমি, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ররা কী বলে মাথায় ঢোকে না। যদি তাই হয়, তার মানে আমি কারো কাজে লাগি না। সত্যি না, জাকির?'

'না, সত্যি নয়।'

গভীর একটা নিশ্বাস নিল মেহ্রিবান।

'আমি কী করতে পারি বলো? সকাল থেকে সন্ধ্যে আর সন্ধ্যে থেকে সকাল শুধু "তিন নং, তিন নং... হ্যালো, হ্যালো!"'

'না, মেহ্রিবান, তুমি ঠিক বলছ না। তুমি অনেক কাজে লাগ।'

'কী কাজ শুনি?'

'তুমি একটি মানুষের হৃদয়ে আনন্দ আন, যে মানুষটি সরকারের অনেক কাজ করে।'

'ঠাট্টা করা হচ্ছে বুঝি?'

মেহ্রিবানের বিষণ্ণ মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাইল জাকির।

'খাসা মেয়ে তুমি, মেহ্রিবান! জীবনে কষ্ট পেয়েছ কিন্তু হাল ছেড়ে দাওনি, কাজ করে চলেছ।'

'ও রকম কাজের মানে কী। শুধু বেঁচে থাকার জন্য কাজ।'

'তোমার ইচ্ছে তাহলে কী?'

'আমি চাই যে লোকের আরো কাজে যেন লাগি। কিন্তু আমি শুধু টেলিফোনের মেয়ে...'

'আমার মতে, সেটা খাসা ব্যাপার, চমৎকার ব্যাপার।'

'কেন শুনি?'

'কারণ, তুমি টেলিফোনের মেয়ে না হলে আমি সেদিন তোমার ওপর চোটপাট করতাম না; চোটপাট না করলে মাপ চাইতে আসতাম না; মাপ চাইতে না এলে তোমাকে দেখতাম না...'

'আবার ঠাট্টা!' ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল মেহ্‌রিবান। 'তুমি যখন নিজের কাজের কথা বল তখন মনে হয় তুমি কত বড়ো, কত শক্তি তোমার — কত বড়ো একটা ডিপার্টের ভার তোমার হাতে!'

'আর এক্‌স্‌চেঞ্জে বসে তোমার হাতে সমস্ত কারখানাটার ভার।'

গভীর নিশ্বাস নিল মেহ্‌রিবান।

'সমস্ত কারখানার ভার হাতে নিতে গেলে অনেক জানা দরকার। আর আমি তো নিজের কাজেই যা জানা দরকার তাও জানি না, যারা টেলিফোন করে তারা প্রায়ই আমার ওপর চটে।'

'কেন? ঠিক কনেক্‌সন দিতে পার না?'

'না, কনেক্‌সন ঠিক দিই। কিন্তু প্রায়ই যাকে ওরা চায় সে

নিজের জায়গায় থাকে না, তখন আমাকে বলে, "তাড়াতাড়ি ওকে খুঁজে বের করুন, জরুরী কাজ আছে, প্রতিটি মিনিট মূল্যবান!" কোথায় খোঁজ করব, কোথায় পাওয়া যাবে, জানি না। বোকার মতো বসে থাকি, কোনো সাহায্য করতে পারি না...'

নিচের ঠোঁট চেপে মিনিটখানেক কী ভাবল জাকির। তারপর হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে বলল:

'কথাটা ঠিক, মেহ্‌রিবান। আমাদের কারখানায় এমন সময় আসে যখন এক মিনিট নষ্ট হওয়া মানে লক্ষ লক্ষ রুবল লোকসান। দাঁড়াও! যদি তোমাকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত কারখানা, প্রত্যেকটা ডিপার্ট আর বিভাগের কাজের সঙ্গে পরিচয় করে দিই, ওদের যোগাযোগ বুঝিয়ে দিই, তাহলে? তাহলে তোমার কাজটা আরো সহজ হবে নিশ্চয়।'

'জান, কথাটা তোমাকে নিজেই বলব ভেবেছিলাম।'

'দেখছ তো, তোমার মনের কথা কেমন করে টের পাই!' হাসতে লাগল জাকির।

দীর্ঘদৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল মেহ্‌রিবান। হৃদয়ে এল ব্যাকুলতা।

"যদি বরাবর তুমি এমনটি থাক!" ভাবল সে।

মেহ্‌রিবানের জীবন এখন পূর্ণতর, আরো আগ্রহে ভরা। কাজ করে, স্কুলে যায়, বাড়িতে পড়াশুনো করে, কারখানার কাজ শেখে।

গ্রীষ্ম হানা দিল হঠাৎ। অসহ্য গরম।

ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এসেছে জাকির ও মেহ্‌রিবান। দালানে আরো সহজে নিশ্বাস নেওয়া যায়, ওখানে পাখা আছে। কিন্তু প্রাঙ্গণে বেরোন মাত্র গরমে মুখ ঝলসে গেল। তাড়াতাড়ি ছায়ায় গিয়ে হিট-একস্‌চেঞ্জারের সেতুর নিচে দাঁড়াল মেহ্‌রিবান, তারপর ল্যাবরেটরিতে যা শুনেছে টুকে রাখতে লাগল। জাকির গাঁট্টাগোট্টা মোটাসোটা মেয়ে-স্টোকারটিকে ডেকে পাইপ থেকে উদ্গত ধোঁয়া দেখিয়ে মন্তব্য করল:

'আবার তোমার চুল্লি ঠিকমতো গরম করা হয়নি, বুলগেইজ্‌-খালা!'

গরম সত্ত্বেও বুলগেইজের চোখ পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা, তন্দুরায় রুটি সেঁকার সময় মেয়েদের মতো। ঝুলিমাখা তেরপলের দস্তানা খুলে মুখ থেকে নেকড়া সরিয়ে হেঁড়ে গলায় জবাব দিল সে:

'কমরেড জালালভ! এ মাসে পাঁচশ ছিয়াত্তর টাকা বোনাস পেয়েছি। আমার মুখ দেখে টাকাটা দিয়েছে? সবাই জানে আমার চুল্লি ঠিকমতো রাখি, সবকিছু আমার ঝকঝকে তকতকে। জ্বালানির খরচা কমাচ্ছি। আমাদের পার্টি কী বলে? খরচা কমাও! তাই খরচা কমাচ্ছি।'

'ওসব আমার জানা আছে, বুলগেইজ-খালা,' বাধা দিয়ে বলল জাকির। বুলগেইজ বকরবকর করতে ভালোবাসে, সে জানে। 'আমি বলছি, আজ তোমার চুল্লি থেকে ধোঁয়া

বেরোচ্ছে। ঠিকমতো গরম করলে ধোঁয়া থাকতে পারে না। আজ কিছু একটা গড়বড় হয়েছে...'

'ঠিক বলেছ, আমার সবকিছু সড়গড়।' ম্যানেজারের কল্পিত প্রশংসায় হাসিতে ভরে গেল বুলগেইজের ঝুলকালিমাখা মুখ — 'তাই তো আমাকে সবাই বাহবা দেয়, তাই তো বোনাস মেলে।'

হিসহিসে চুল্লিগুলোয় প্রায় তিরিশ বছর কাজ করেছে বুলগেইজ, এখন কানে কম শোনে। সে বলে চলল:

'আমার আর কী করার আছে বল? আমি একলা মেয়েছেলে, আমার কেউ নেই। যা কামাই ব্যাঙ্কে রাখি। বেশি কিছু জমেনি, কমও নয় অবশ্য, প্রায় ঊনত্রিশ হাজার টাকা।'

এসময় মেহ্‌রিবান নোট লেখা শেষ করে ওদের কাছে এল। পিটপিটে চোখে তাকে দেখে নিয়ে নিশ্বাস টেনে আবার কথা শুরু করল বুলগেইজ:

'সত্যি, ম্যানেজার মশাই, আমার ছেলেটা আর ফিরল না...'

'বুলগেইজ-খালা, আমি ঝুলের কথা বলছি, ঝুলের কথা!' জাকিরের ধৈর্যের সীমা পেরিয়েছে।

'সত্যি, জীবনে কতো ভুল হয়, কতো ভুল! আমি তো হামেশা একলা। একা থাকা বড়ো খারাপ, কমরেড ম্যানেজার!'

মোটা বেঁকা আঙুলে মেহ্‌রিবানকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তোমার হবু-বৌ বুঝি?'

লাল হয়ে উঠে চোখ নামাল মেহ্‌রিবান। সাদাসিধে

স্ত্রীলোকটির অকপট প্রশ্নে বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল তার। কী একটা নতুন উত্তেজনা দীর্ণ করল তাকে। বেশ কয়েক দিন তো জাকিরের সঙ্গে সারা কারখানাটায় ঘুরেছে, অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, নমস্কার জানায় তারা। জাকির সহজে সাবলীলভাবে জবাব দিয়ে তেমনি অনায়াসে এগিয়ে যায়। মেহ্‌রিবান কিন্তু চোখ তুলে তাদের দিকে তাকাতে পারে না। কেন? এ পর্যন্ত একবারও ভাবেনি, কেন পারে না। মোটাসোটা সহৃদয় স্ত্রীলোকটি তাকে দেখে যা ভেবেছে হয়ত অন্যরাও তাই ভাবে? জাকিরের সঙ্গে সবসময় কারখানায় ঘোরে, জাকির কাউকে দেখে লজ্জা পায় না, তার মানে হয়ত জাকিরও তাকে দেখে বাগ্‌দত্তার মতো? তাহলে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত একটি কথা বলেনি কেন? কম্পিত চোখের পাতা তুলে সে তাকাল জাকিরের দিকে, দেখি জবাবে কী বলে। মেহ্‌রিবানের সন্দেহ নেই যে জাকির এক্ষুণি বলবে: "হ্যাঁ, আমার বাগ্‌দত্তা!" ও তো সাহসী লোক, যা চায়, যা ভাবে তাই সর্বদা বলে। জাকির কথাটা বলছে ভেবে তার আরো বিব্রত লাগল, আরো লাল হয়ে উঠল সে, বুলগেইজের দিকে তাকানোর সাহস হল না।

'না, বুলগেইজ-খালা,' জাকিরের শান্ত কণ্ঠস্বর কানে এল মেহ্‌রিবানের। কেঁপে উঠল মেহ্‌রিবান। শরীর হিম হয়ে গেল, মুহূর্তের জন্য হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। কেন বলল এমনভাবে?

মুখ তুলে দেখল জাকিরও তার দিকে তাকিয়ে আছে...

স্বস্তির নিশ্বাস বুক ভরে নিল মেহ্‌রিবান। জাকিরের

চোখে কত অনুরাগ, যেন বলছে, "আমি যা বললাম বিশ্বেস করো না, মেহ্‌রিবান! আমি তোমাকে ভালোবাসি, কত ভালোবাসি!"

আর সে চোখকে বিশ্বাস করল মেহ্‌রিবান...

সামনে দিয়ে যন্ত্রচালকদের সহকারী যাচ্ছিল, তাকে ডেকে ধোঁয়া দেখিয়ে দিল জাকির। সে কোনো কথা না বলে বুলগেইজের হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে গেল।

সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রইল জাকির ও মেহ্‌রিবান; কোনো কথা নেই। এ স্তব্ধতা ভাঙা দরকার, কিছু একটা বলা, কিছু একটা করা চাই। ঠিক সেসময় বেড়ার ওপার থেকে শোনা গেল চীৎকার আর শিস। ল্যাবরেটরিটা প্রাঙ্গণের উঁচু একটা জায়গায়, সেখান থেকে বেড়া পেরিয়ে চোখে পড়ে সমুদ্রের দিকে যাওয়া রাস্তাটা। সেদিকে ফিরে দুজনে দেখল রাস্তায় একটি মেয়ে দৌড়িয়ে আসছে। পেশল শক্ত গায়ে এঁটে বসেছে পুরোনো ফিকে হয়ে-আসা রঙবেরঙ সারাফান, দৌড়ের বেগে কেঁপে উঠছে শরীর; মনে হয় সারাফানটা ফেটে পড়বে।

লেমনেডের দোকানে দাঁড়ানো বাচ্চারা শিস দিয়ে চেঁচিয়ে উসকাচ্ছে:

'দাঁড়াও!'

'ধর ওকে।'

'ধর, ধর!'

ছুটতে ছুটতে মেয়েটা ফিরে হাত মুঠো করে ওদের দেখাল।

ঘামে তার মুখ আর ঘাড় চকচক করছে, কাঁধের হাড়ের মাঝখানে মেরুদণ্ডে কালো একটা ছাপ ছড়িয়ে পড়ছে।

কারখানার ফটকের কাছে এসে ওকে দাঁড়াতে হল: লরির একটা লম্বা লাইন বেরিয়ে আসছে। সবকটার বনেট তোলা ইঞ্জিন যাতে বেশি গরম না হয়। বেঢপ গাড়িগুলোকে দেখাচ্ছে শক্ত ডানা ছড়ানো বিরাট গুবরে পোকার মতো।

ফাঁক পেয়ে মেয়েটি গাড়ির মধ্যে পথ করে প্রাঙ্গণে দৌড়ে এল।

'এ তো নাইলিয়া, মেয়ে নয় তো, আগুন!' বলল জাকির, তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল তার কাছে। এত তাড়াতাড়ি গেল যে মেহ্‌রিবানকে পিছু পিছু প্রায় ছুটতে হল।

'কমরেড জালালভ, কমরেড জালালভ!' হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল নাইলিয়া। 'ওরা ওঁকে বের করে দিচ্ছে! বের করে দিচ্ছে... হাকিম দাদাশ...'

'দম নাও তো আগে, তারপর কী হয়েছে বলো!' কঠোর সুরে বলে উঠল জাকির।

ওঠানামা করা তুঙ্গ বুকে হাত রাখল নাইলিয়া হাঁফ নেবার জন্য। অনাবৃত তামাটে হাতদুটো যেন ব্রোঞ্জে খোদাই। মুখটাও বেশ তামাটে, তবে উজ্জ্বল; রোদে-পোড়া চামড়া-খসা বোঁচা নাকের ডগায় লাল একটা দাগ। কেশবিন্যাসে মনে হল তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, ক্রমাগত সমুদ্রস্নান আর রোদে পোড়ার

ফলে সোনালি-ধূসর চুল জট পাকিয়ে বেশ খোঁচা খোঁচা হয়েছে। চোখদুটো শুধু রোদে পোড়েনি, তাতে স্বচ্ছ নীলাভা।

'সেই বিজ্ঞানী দেখতে এসেছিলেন আমাদের যন্ত্রাগারের জায়গাটা আর হাকিম দাদাশ ও ইমামভের্দি তাঁকে বললেন চলে যেতে, বললেন যেন সব আশায় জলাঞ্জলি দেন!'

'কোন বিজ্ঞানী? মানসুরভ?'

'তিনি।'

রাগে ঠোঁট চেপে ভুরু কোঁচকাল জাকির।

'চল,' বলল মেয়েদুটিকে।

কারখানার প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে, রেলপথ পেরিয়ে তিনজনে বাঁয়ে মোড় নিল, পেট্রল সাঁকো অতিক্রম করে কারখানার পুরোনো এলাকার গেট পার হল। এখানে তৃতীয় যন্ত্রাগারটির আস্তানা। জাকিরের চার নং ডিপার্টের অধীনে এটি। যন্ত্রাগারটির এলাকা বিরাট। এখানে সবকিছু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খাপছাড়া অকেজোভাবে, তাই কাজ করা বেশ কষ্টসাধ্য। কারখানার ছোকরাদের ভাষায়, যন্ত্রাগারটি মান্ধাতার আমলের। প্রকাণ্ড বড়ো ভিত্তির উপর বসানো পেট্রল ট্যাংকগুলিকে চুনকাম করা হয় হামেশা, কিন্তু তাদের রুপোলি রঙ বা যন্ত্রাগারটিকে আধুনিক একটা চেহারা দেবার জন্য হাকিম দাদাশ ও ইমামভের্দির শত চেষ্টা সত্ত্বেও জায়গাটা যেন জরার দাঁত বের করে আছে। অনেক বয়স হয়েছে যন্ত্রাগারটির, কারখানার এই দুটি অভিজ্ঞ কর্মীর মতোই। পুরোনো ও নতুন কারখানা

এলাকার মাঝখান দিয়ে যাওয়া এ্যাসফল্টের চওড়া রাস্তাটা যেন ইচ্ছে করে সীমারেখা টেনেছে পুরাতন ও নূতনের মধ্যে।

ফুঁসন্ত পাম্প আর হিট-একস্‌চেঞ্জারের কালো বাড়ি পেরিয়ে জাকির ও তার সঙ্গিনীরা শাদা রঙ দেওয়া সেতু হয়ে প্রাঙ্গণের পরের অংশটায় নামল। তলায় নজরে পরে চকচকে গ্যালারিসুদ্ধ একতলা একটা দালান, যন্ত্রাগারের পরিচালকদের আস্তানা। দালানের সামনে ফুলের কেয়ারি, চকচকে রঙ করা ইঁটের বেড়ায় ঘেরা। বছর পঁয়তাল্লিশের একটি লোক বেড়ার উপরে ক্লান্ত ভঙ্গীতে বসে কোলে হাত রেখে চেয়ে আছেন ফুলের দিকে, ব্রোঞ্জ রঙা গুবরে পোকা গুটি গুটি চলেছে সেখানে। লোকটির কপালে রেখা পড়েছে, সমস্ত চেহারায় অত্যাধিক চিন্তার ছাপ। সিল্কের সার্টে উড়ে পড়ছে ঝুলের কালো ছোপ, বিবর্ণ মুখে সেঁটে যাচ্ছে।

দ্রুতপায়ে তার কাছে গেল জাকির।

'নমস্কার, প্রফেসর! মাপ করুন, আপনাকে এখানে বোধ হয় চিনতে পারেনি।'

মাথা তুলে আগেকার মতোই শূন্য দৃষ্টিতে মানসুরভ তাকাল জাকিরের দিকে।

'কিন্তু আমি তো ওদের বললাম যে আমি...'

জাকিরের মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল।

'আপনি আসছেন সেটা আগে থেকে আমাকে জানালে ভালো হত।'

'আগে থেকে তোমাকে সাবধান করে কী ফয়দা হত? না দোস্ত, ব্যাপারটা যত সহজ মনে করছ তত নয়। যন্ত্রাগারের ম্যানেজারের নিজের মতামত আছে' — মানসুরভের কপালের রেখাগুলো আরো ঘন হয়ে উঠল— 'মজার বুড়ো...'

প্রত্যয়ের সঙ্গে হাসল জাকির।

'হুঁ... ব্যাপারটা এরিমধ্যে কিন্তু ফয়সলা হয়ে গিয়েছে, প্রফেসর। "আজনেফ্‌ত" কারখানা আর আমাদের ডিরেক্টর একযোগে আমাদের খসড়াটার অনুমোদন করেছে।'

'তা হলে তো খুব ভালো। সবকিছু ঠিকভাবে শেষ হবে, তাই ভাবতে চেয়েছিলাম, জাকির।' মানসুরভ দাঁড়িয়ে নিজেকে সোজা করে নিল। কপালের রেখা উধাও হল এক নিমেষে, বয়স যেন কমে গেল। 'কোত্থেকে জানলে যে আমি এখানে?'

নাইলিয়ার দিকে মাথা নেড়ে জাকির বলল:

'এই তুখোড় মেয়েটি খবর দিল। ওর নাম নাইলিয়া। যন্ত্রচালকদের সহকারী।'

নাইলিয়ার করমর্দন করে মানসুরভ মেহ্‌রিবানের দিকে তাকিয়ে খোশমেজাজে জিজ্ঞেস করল:

'আর এই খুকিটি?'

জাকিরের পাশে মেহ্‌রিবানকে নিতান্ত ক্ষুদে দেখায় অবশ্য। চোখ নামিয়ে সে অস্থির অপেক্ষায় রইল, এবার জাকির কী বলে।

হেসে জাকির তার হাত ধরে বিনা কুণ্ঠায় কাছে টেনে বলল:

'মেহ্‌রিবান, আমাদের টেলিফোনে কাজ করে।'

মানসুরভ ও নাইলিয়া দৃষ্টি বিনিময় করল। জাকির সঙ্গে সঙ্গে মেহ্‌রিবানের হাত ছেড়ে দিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মেহ্‌রিবান।

'আপনি উত্তেজিত হবেন না, প্রফেসর,' স্বভাববিরুদ্ধ বিনীতভাবে শুরু করল নাইলিয়া। 'আমরা সবাই... আমি, আমার বন্ধুরা, আমাদের কমসমল সদস্যরা সবাই, কারখানার অল্পবয়সী সকলেই চায় যে আপনার যন্ত্রাগারটি এখানে গড়া হয়, পুরোনোটার জায়গায়। আমরা সবাই তাতে কাজ করব। তাড়াতাড়ি যাতে হয় সেজন্য আমরা যন্ত্রাগারের নির্মাণে যোগ দেব।'

দেখছেন তো, প্রফেসর,' খুশি হয়ে বাধা দিয়ে বলল জাকির, 'আপনি মিছিমিছি একজন একগুঁয়ে বুড়োর ওপর রাগ করছিলেন!'

মাথা নাড়ল মানসুরভ।

'একজন নয় আর একজন বুড়োও সঙ্গে ছিল — কী দারুণ জমকালো গোঁফ তার!'

'ওদের সঙ্গে এখ্‌খুনি আমি বার্তাচিৎ করব,' জাকির দ্রুতপায়ে অফিসঘরের দিকে গেল।

মানসুরভের দিকে চেয়ে খুক করে উঠে ফিরে দাঁড়াল নাইলিয়া, হাসি চাপা মুশকিল।

'তোমার আবার কী হল?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল প্রফেসর।

উত্তর দিল না নাইলিয়া। চোখ তুলে আর একবার দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মানসুরভের মুখে।

'হাসি পাচ্ছে কেন? বলে ফেল, সবাই মিলে হাসি।'

নাইলিয়া হাসিতে ফেটে পড়ল।

'আপনার সমস্ত মুখে ঝুল কালি!'

তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে রুমাল বের করে মানসুরভ মুখ আর ঘাড় সাফ করতে লাগল। তাতে ব্যাপারটা আরো খারাপ দাঁড়াল। গোটা মুখ ভরে গেল কালো কালো ছোপে।

নাইলিয়া হেসে খুন, লজ্জার বালাই আর নেই:

'সব তো ছড়িয়ে ফেললেন এবার! চলুন, সাবান তোয়ালে দিই, মুখটা ধুয়ে ফেলুন।'

'অনেক দূর যেতে হবে?'

'না, এই তো কাছেই, যন্ত্রচালকদের ঘরে।'

ময়লা রুমালটার দিকে চেয়ে মানসুরভ তার অনুগমন করল। চকচকে রঙ দেওয়া যে বাড়িটায় জাকির অদৃশ্য হয় সেদিকে গেল মেহ্‌রিবান।

দীর্ঘ গ্যালারিটা ভিড়াক্রান্ত। যন্ত্রাগারের শ্রমিকরা ছোট বড়ো দল বেঁধে দাঁড়িয়েছে, কী নিয়ে যেন গরম বাদানুবাদ বিচার চলেছে। হাতে কলমে এখানে শেখার জন্য আসা কারিগরি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কেউ বা এ দলে, কেউ অন্য জটলার কাছে

গিয়ে উৎসাহভরে শুনছে ব্যাপারটা। একটা দরজার ফলকে লেখা "যন্ত্রাগারের ম্যানেজার"। সেদিকে গেল মেহ্‌রিবান। হৈ হট্টগোলের মধ্যে কখনো পুরুষের কখনো স্ত্রীলোকের গলা শোনা যাচ্ছে। প্রাচীরপত্রিকার কাছে হাকিম দাদাশের কামরার সামনে সবচেয়ে ভিড়।

'হায় আল্লা, আমাদের যন্ত্রাগারটা কিসের ওপরে বসিয়েছে?' আমিনা অস্থির দৃষ্টিতে আশেপাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'খাস একটা কচ্ছপের ওপর, আমিনা-খালা!'

ভ্রূ কুঞ্চিত হল আমিনার।

'কী বিচ্ছিরি! দেখলে গা ঘোলায়।'

'এই শেষ নয় আমিনা-খালা,' একটি মেয়ে সানন্দে উস্‌কে দিয়ে বলল, 'এভাবে চললে এর চেয়ে বিদঘুটে জানোয়ারের পিঠে যন্ত্রাগারটা চাপাবে!'

'সে আবার কী?' ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল আমিনা।

'এই ধরুন, গল্লাচিংড়ীর ওপর!'

'আল্লা দোয়া করুন! দুর্গন্ধ সইবে না আমার!'

'গল্লাচিংড়ীতে তোমার এত অরুচি কেন শুনি?' গমগমে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কামরা থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহ, চওড়া-কাঁধ, লম্বা পাকা গোঁফওয়ালা একটি বৃদ্ধ, ভিড় ঠেলে গেল প্রাচীরপত্রিকার কাছে।

‘গল্দাচিংড়ী তো অতি মুখরোচক জিনিস, বলা যায় শৌখীন খাদ্য। মাছের চেয়ে সুস্বাদু...’

ফূর্তিবাজ মেয়েটি ফস করে বলল:

‘ঠিক কথা, তবে একটা জিনিস খারাপ: চিংড়ী হামেশা পেছন হটে!’

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। দীর্ঘদেহ বৃদ্ধ কী ভাবতে ভাবতে তাড়াতাড়ি গোঁফে মোচড় দিতে লাগল।

বৃদ্ধটি যন্ত্রাগারের প্রবীণতম কর্মী—ইমামভের্দি। সত্তর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু খাড়াশক্ত হাসিখুশি লোক। দেখে মনে হয় না পঞ্চাশের বেশি বয়স।

‘চুপ!’ চটে কমবয়সীদের উদ্দেশ্যে হাঁকল বৃদ্ধ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ নরম হয়ে গেল। গোঁফের মতোই পাকা কড়া ভুরু বিষণ্ণভাবে ঝুলে পড়ল। হাত বাড়িয়ে ঠাট্টা করে তুখোড় মেয়েটির চুল ঘেঁটে দিয়ে গোমড়ামুখে গেল ম্যানেজারের কামরার দিকে। দরজায় মেহ্‌রিবানকে দেখে অভ্যাসবশে বিনা ভূমিকায় তার চুল ঘেঁটে দিয়ে জিজ্ঞেস করল:

‘নতুন এসেছ বুঝি?’

কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না মেহ্‌রিবান:

‘আমি... না... আমি এখানে...’

কথাটা না শুনেই কামরায় গেল ইমামভের্দি। দরজাটা আধ খোলা রইল।

উ'কি মেরে দেখল মেহ্‌রিবান। বেশ বড়ো কামরা, কিন্তু বলতে গেলে অন্ধকার। উত্তরমুখো ছোট্ট জানলা দিয়ে খুব কম আলো ঘরে ঢুকেছে। টেবিলে একটা বাতি জ্বলছে।

ঘরের যে জিনিসটা প্রথমে তার চোখে পড়ল সেটা হল ভারি সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো একটা প্রকাণ্ড ছবি। ব্রদ্‌স্কি'র আঁকা "স্‌মোল্‌নিতে লেনিন"এর কপি।

তিন নং যন্ত্রাগারের ম্যানেজার হাকিম দাদাশ থমথমে মুখে নিজের টেবিলের সামনে বসে আছে। টেবিলের বাতির আলোয় চকচক করছে মাথাভরা টাক। কথা বলছে আস্তে আস্তে, মেপেজুকে: তেল না দেওয়া গরুর গাড়ির চাকার মতো কি'চকি'চে তার কণ্ঠস্বর। সিগারেট হোল্ডারটা এক টুকরো তারে সাফ করে তামাকের গুঁড়ো ছাইদানে ঝেড়ে সে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল অস্থিরভাবে পায়চারি করা জাকিরের দিকে। তারপর ভারিক্কিভাবে বলল:

'বাছা, একটি পুরোনো বন্ধু দুটি নতুনের চেয়ে ভালো।'

শুকনো গলায় আপত্তি জানাল জাকির:

'ওটা মানুষের বেলায় খাটে, ই'টপাথর বা পাইপের বেলায় নয়।'

'এমন একটা সময় আসে যখন ই'টপাথরও মানুষের কাছে আদরের জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। আরো বেশি করে এই জন্য যে, এ সব ই'টপাথর নিজের হাতে আনেন আমার বাবা। আমি ছোট্টবেলা থেকে কারখানায় আছি; মালিকের কাছ থেকে

কারখানা ছিনিয়ে মজুরদের হাতে তুলে দেবার জন্য বিপ্লবে যোগ দিয়েছি।'

'তার জন্য ধন্যবাদ!' অধৈর্যভাবে গলা চড়িয়ে বলল জাকির। 'কিন্তু এখন যন্ত্রাগারটা কোনো কাজে লাগবে না। আমাদের বাধা দিচ্ছে। আপনি কি বোঝেন না যে এটার কোথাও ঠাঁই নেই এখন?'

ঘন শক্ত ভুরুর নিচে থেকে জাকিরের প্রতি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে ইমামভের্দি জিজ্ঞেস করল:

'অর্থাৎ, আমরা বুড়ো হলে আমাদেরও কোনো ঠাঁই থাকবে না? আমাদেরও রাস্তায় ফেলে দেওয়া হবে?'

'আপনারা নতুন যন্ত্রাগারের কাজ ক্রমে ক্রমে রপ্ত করে নিতে পারেন, পরিচালনা শিখে নিতে পারেন! মামুলি একটা যন্ত্রাগার হবে না এখানে, আমাদের ডিপার্টের উপযুক্ত আধুনিক একটা ছোট্ট কারখানা হবে। তার উৎপন্নে লুব্রিকেটিং তেলের গুণ বাড়বে, তাতে নানা যন্ত্র ও যন্ত্রপাতির আয়ু অনেক দীর্ঘ হবে। সরকারের লক্ষ লক্ষ রুবল বাঁচাব আমরা। এবার বলুন: কোথায় কাজ করে বেশি সম্মান? অন্যান্য যন্ত্রাগারের জন্য শুধু তেল গরম করা এই হতভাগা জায়গাটায়, না সুন্দর নিখুঁত একটা যন্ত্রাগারে?'

মিনিটখানিক স্তব্ধতা। সিগারেট হোল্ডারটা আর একবার ঝেড়ে মাথা নাড়ল হাকিম দাদাশ।

'বুড়ো বয়সে আবার হাতেখড়ি? না, কমরেড জালালভ,'

নিশ্বাস নিয়ে বলল ইমামভের্দি, 'এ যন্ত্রাগার না থাকলে এখানে আমাদের কিছু করার নেই। সবকিছু পুরোনো জিনিসকে বাতিল করা চলে না। আমাদের প্রায় গোটা জীবন এখানে কেটেছে, আমাদের সবচেয়ে সুখের স্মৃতি এ যন্ত্রাগারের সঙ্গে জড়িত। রোজ সকালে গেটের কাছে আসা মাত্র শুনেছি, পাম্পের ফোঁসফোঁসানি, মনে হয়েছে যেন আমাদের বলছে, "সেলাম, ইমামভের্দি, শুভপ্রভাত, হাকিম!" এখানে তোমার মতো কত শত ছোকরা হাতে কলমে শিখেছে, তুমিও শিখেছ মনে হয়। এ যন্ত্রাগার তোমাদের সবাইকে শিখিয়েছে প্রায় তোমাদের মায়ের মতন — এমন অকৃতজ্ঞ কেমন করে হই?'

হাকিম দাদাশ জিজ্ঞেস করল, গলায় একটা অসীম অনুরোধের সুর:

'অন্য কোথাও নতুন যন্ত্রাগারটা বানালে চলে না?'

আবার বেজে উঠল জাকিরের শুকনো, কঠোর গলা:

'না! কেননা নতুন যন্ত্রাগারের জন্য যে সব কাঁচামাল দরকার সেগুলো এইখানে আমাদের কারখানায় তৈরি হয়।'

হাকিম দাদাশ ঘুরে তাকাল বন্ধুর দিকে, যেন সমর্থনের প্রত্যাশায়। কিন্তু হঠাৎ একেবারে ভেঙে পড়ে চেয়ারে বসল।

শান্তভাবে ধীরে ধীরে বলতে লাগল হাকিম:

'প্রথম যখন এখানে আসি তখন আমার বয়স দশ। তখন ছিলাম এ্যাপ্রেণ্টিস স্টোকার। প্রায়ই রাত কাটাতে হত এখানে। ঠাণ্ডা রাতে জমে যাওয়া শরীর গরম রাখত চুল্লিগুলো। ফুরসৎ

পেলে স্টোকারের কামরায় ঘুমোতাম, চুল্লিগুলোর মসৃণ আওয়াজে ঘুম আসত, কত সুন্দর স্বপ্ন দেখতাম। পুরো ষাট বছর, ইমামভের্দি, বলাটা কত সহজ! এখন কী করে এখান থেকে চলে যাই?'

'আর আমি?' বিষণ্নমুখে শুধাল ইমামভের্দি।

কথাবার্তা শুনে মেহ্‌রিবানের মনে হল গলা আটকে গিয়েছে তার। জাকিরের কণ্ঠস্বরে সে চমকে উঠল:

'দুটো মানুষের জন্য এত বড়ো একটা কাজ আমরা ছেড়ে দিতে পারি না! এ ভাবে তো কোনো কিছুকে ভালো করতে, নতুন করতে আমরা পারব না, কোনো কিছুতে হাত দেবার জো থাকবে না, কেননা প্রত্যেক কিছুর সঙ্গে কারো না কারো স্মৃতি জড়িত আছে!'

আবার সিগারেট হোল্ডারটা ঠুকে সেটাকে টেবিলে ফেলে দিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে উঠল হাকিম দাদাশ।

'তার মানে, ভাঙবে?'

'হ্যাঁ, যত শীগগির পারি। আর সবুর করা উচিত নয়।'

'আর আমাদের কী হবে? রাস্তায় ঠেলে দেবে না কি?'

জবাবটা যেন আগে থেকে তৈরি ছিল:

'সরকারের কাছ থেকে ভালো পেনসন আপনারা পাবেন।'

'রিটায়ার করি কি না করি, সেটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার!' হাকিম দাদাশের ছোট্ট শাণিত চোখ জাকিরের দিকে ঝকঝক করে উঠল।

'তাহলে আমার কাজে ব্যাঘাত দেবেন না!' কঠোর সুরে বলে চলে যাবার জন্য চট করে পা বাড়াল জাকির। দরজার কাছে থেমে বলল:

'আর একটা কথা। আমাদের কাছে কোনো অতিথি এলে তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা দরকার। তাদের তাড়িয়ে দেবার কোনো অধিকার আপনাদের নেই!'

হাকিম দাদাশের পুরু সামান্য ঝোলা ঠোঁটে তিক্ত বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল:

'জো হুকুম!'

'মুখের মতন জবাব!' সক্রোধে বলে দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল জাকির। মেহ্‌রিবানের গা ঘেঁষে গিয়েও দেখতে পেল না তাকে, গ্যালারি হয়ে তাড়াতাড়ি চলল বহির্পথের দিকে।

"প্রতিদিন এদের গলা শুনি টেলিফোনে, যা নম্বর চায় তা দিই, অথচ আজ পর্যন্ত এদের চিনিনি," মেহ্‌রিবান ভাবল। "কী চমৎকার লোক, কী মর্যাদা বৃদ্ধদের! অবশ্য জাকির যা বলেছে তাও ঠিক। তবু কেমন যেন কঠোর, নিষ্ঠুর..."

দেয়ালের ঘড়িতে চোখ পড়াতে দেখল সিফ্‌ট শুরু হতে মাত্র তিন মিনিট বাকি, দৌড়ল এক্‌স্‌চেঞ্জে।

...কয়েকদিন মেহ্‌রিবান কাউকে কিছু না বলে নিজের অভিজ্ঞতাকে যাচিয়ে নিল। কোনো কর্মীকে টেলিফোনে ডাকল, দেখা গেল সে নিজের জায়গায় নেই, তখন মেহ্‌রিবান তাড়াতাড়ি ভেবে বের করার চেষ্টা করত লোকটা কোথায় থাকতে

পারে, কর্মসূত্রে কী কী বিভাগের সঙ্গে তার যোগাযোগ? ডিপার্ট আর বিভাগে ফোন করত সে, প্রায়ই অনুসন্ধান সফল হত। অবশ্য নানা বিভাগ, ডিপার্ট, কর্মশালা এবং ল্যাবরেটরির সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা মনে রাখা অত্যন্ত কঠিন। তার জন্য সবচেয়ে আগে দরকার অসংখ্য লাইনের জটিল ছকটা কল্পনা করার ক্ষমতা। জাকিরের সাহায্যে ছকটা সে আঁকে, দেখতে সেটা বড়ো একটা মানচিত্রের মতো। মেহ্‌রিবানের মনে হল কারখানাটা গোটা একটা পৃথিবী, নিজস্ব তার নানা মহাদেশ — ডিপার্ট, নানা বিভাগগুলো যেন সহর, রেল ও অন্যান্য পথ যেন নদী। প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটার যোগাযোগ।

জাকিরের সঙ্গে সারা কারখানায় না ঘুরলে, অলিতে-গলিতে উঁকি না মারলে ছকে আঁকা জিনিসটা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকত না। এখন ফুরসৎ পেলেই সে ছকটা বের করে মন দিয়ে দেখে। প্রতিদিন কারখানার সম্বন্ধে তার ধারণা পূর্ণতর হতে লাগল।

এক নং ডিপার্টের যন্ত্রাগার থেকে ফোন করে চাইল মাপযন্ত্র বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়রকে। বিভাগে নেই। মেহ্‌রিবান জানত যে যন্ত্রাগারে প্রধান ইঞ্জিনিয়রের ডাক পড়ার মানে ব্যাপার গুরুতর। মনে পড়ল যে আগের দিন তিন নং ডিপার্টের একটি যন্ত্রাগার চাপযন্ত্র নিয়ে অনুযোগ করেছে, সেখানে ফোন করে মেহ্‌রিবান ইঞ্জিনিয়রকে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেখানে তাকে চায় সেখানে কনেক্‌সন দিল। মেহ্‌রিবানকে তারা ধন্যবাদ জানাল।

এ কদিন প্রায়ই মেহ্‌রিবানকে লোকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কথা বলল, শুনে ভারি ভালো লাগত তার। কাজে আরো মন দিল, তার ইচ্ছে লোকের কাজে যেন লাগে। সে ইচ্ছার দীপ্তি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল তার মধ্যে, এখন কাজের অর্থ ও উদ্দেশ্য তার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে।

'তিন নং। হ্যাঁ, আমি... তিন নং। আমি, আমি... দাঁড়াও জাকির! তিন নং। দিচ্ছি। কী বললে তুমি?'

'বললাম, হঠাৎ কোথায় চলে গেলে?'

'দোরগোড়ায় তো দাঁড়িয়ে ছিলাম। এত তাড়াতাড়ি চলে গেলে যে দেখতে পেলে না।'

'বুড়োদুটো বড়ো জ্বালিয়েছে।'

'তুমি কিন্তু বড্ডো শক্ত কথা বলেছ ওদের।'

'হুঁম... আচ্ছা তোমার সঙ্গে একটা ফয়সলায় আসা যাক।'

'মানে, তোমার কাজে নাক না গলাই, তাই তো?'

'সেটা নিয়ে পরে কথা হবে।'

'তিন নং। কথা বলুন... জানো জাকির, কারখানার হালচাল জেনে কাজে খুব সুবিধে হচ্ছে। কাজ ক্রমশ ভালো হচ্ছে।'

'শুনে খুব খুশি হলাম।'

'কাল সকালে আবার আসব না কি?'

'না, মেহ্‌রিবান, কাল দরকার নেই। কাল মানসুরভ আর স্থপতির সঙ্গে দেখা করতে হবে। কাজ করতে হবে ওদের সঙ্গে।'

'পরশু দিন?'

'পরশু দিনও তাই।'

'তারপরে?'

'এবার সবসময় কাজ লেগে থাকবে। আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলায় দেখা করা যাক, আমাদের সেই বেঞ্চিতে।'

'কখন?'

'কাল সন্ধ্যেবেলায়।'

'কাল আমার রাত্তিরে কাজ।'

'তাহলে পরশু।'

'তুমি আবার ফোন করবে তো?'

'যদি পারি তাহলে।'

'এখন কোথা থেকে কথা বলছ?'

'বাড়ি থেকে।'

'তুমি একলা?'

'না, তুমি তো আছ আমার সঙ্গে।'

মেহ্‌রিবান হাসল। বিরস হাসি।

'জাকির... আমার মনে হয়... দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। তিন নং। গ্যারাজ দিচ্ছি। কথা বলুন। ক্লাব? নিন। জাকির, আমার মনে হয়... একটু দাঁড়াও! তিন নং। ডেসপ্যাচার? দিয়েছি। জানো, আমার মনে হয় যে...'

ইয়ারফোনে বিরক্তির একটা আভাস ফুটে উঠল:

'কী হয়েছে শুনি?'

মেহ্‌রিবানের বুকটা আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

‘কিছু না …’

‘তবু শুনি …’ অধৈর্য সুরে জাকির জিজ্ঞেস করল।

মেহ্‌রিবানের ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে, আজ তার সঙ্গে সে কেন অন্য রকম ব্যবহার করছে। আজকে চুল্লির স্টোকার বুলগেইজ এবং মানসুরভের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে তার হৃদয় অশান্ত অস্থির। অনেক কথা জাকিরকে জিজ্ঞেস করার আছে, তার কাছ থেকে আশ্বাস সে চায়, কিন্তু জাকির আগেকার মতো করে আজ কথা বলছে না বুঝতে পেরে মেহ্‌রিবান যেন মূক হয়ে গেল।

কিছু না বলে তাই লাইন কেটে দিল, শেষ হল কথাবার্তা। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার ফোন করল জাকির।

‘লাইন কেটে দিলে কেন?’

জাকির যে আবার ফোন করবে মেহ্‌রিবান ভাবেনি। নিজের খুশি চেপে রাখার চেষ্টা করতে করতে এড়িয়ে যাবার মতো করে বলল:

‘জানি না কেন কেটে গেল। ভুল করে …’

‘সিফ্‌টের পর এসে তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেব না কি?’

‘না, মিছিমিছি কষ্ট কেন করবে।’

‘পরশু আসছ তো?’

‘আসব …’

‘“শুভরাত্রি” কেন বলছ না?’

‘এখনো সন্ধ্যে পর্যন্ত হয়নি। আজকে আর ফোন করবে না?’

‘পারলে করব। এখনি স্থপতির কাছে যাচ্ছি, খসড়ায় দু-একটা জিনিস ঠিক করতে হবে।’

‘ভালোয় ভালোয় যেও।’

১০

সিফ্‌টের পর মাহ্‌বুবা আর ভালিদা মেহ্‌রিবানের সঙ্গে বেরল। মেহ্‌রিবান ট্র্যামের দিকে যাচ্ছে, মাহ্‌বুবা তার হাত ধরে বলল:

‘এমন সুন্দর দিনে ট্র্যামে চাপতে হবে না। আমি আর ভালিদা সহর পর্যন্ত হেঁটে তোমাকে পৌঁছিয়ে দেব।’

সাগ্রহে রাজী হল মেহ্‌রিবান।

কলকারখানা আর ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় ভারি, অসংখ্য মোটরগাড়ির পেট্রোলের গন্ধে আতুর গুমোট ভারি হাওয়ায় সূর্যের তাপে অকালে ফোটা বাবলা ফুলের অস্ফুট গন্ধ। রেলপথে চাকার অবিশ্রাম খটখট আওয়াজে তিনটি মেয়ের লঘু পদধ্বনি চাপা পড়ছে, অন্তহীন সারিতে চলেছে পেট্রোলের ট্যাংক।

এ্যাসফল্টের চওড়া ঝকঝকে মসৃণ বুকে রাস্তার আলো প্রতিফলিত, একটার পর একটা লরি আর হালকা গাড়ি চলেছে। আর সহরের নানা শব্দের এই ঐকতানের মধ্যে মুখর একটা মূল সুরের মতো কারখানার যন্ত্রাগার আর চুল্লির ডাক কখনো

উঁচু কখনো নিচু পর্দায় একটানা ধ্বনিত হচ্ছে। ভারি নিশ্বাস ফেলছে পাম্পগুলো। মাঝে মাঝে সে একটানা সুর ভেঙে যাচ্ছে উদ্‌গত বাষ্পের তীক্ষ্ন শিসে, বাষ্পের হালকা মেঘ নিমেষে মিলিয়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। ভারি গলায় আচমকা হাঁকে বন্দরে আসা ট্যাঙ্কারগুলো কারখানাকে জানাচ্ছে তাদের আগমন বার্তা। ইঞ্জিনের সুতীব্র ডাক যেন সাড়া দিচ্ছে তাদের।

ওয়াগনভর্তি কয়েকটা ইয়ার্ড মেয়েরা পার হল। কারখানার কমবয়সীদের প্রিয় নিরালা জায়গা। এখানে ওয়াগনের পেছনের ঢাকা জায়গায় জোড়ায় বসে তারা স্বপ্ন দেখে, হয়ত বা কল্পনা করে কোথায় যেন তারা চলেছে... বাড়িমুখো তরুণ তরুণীদের কণ্ঠস্বর ভেসে এল নিজামি পার্ক থেকে। কে যেন উঁচু কাঁপা গলায় ককেশাসের একটি লোকগান ধরল; এক একটা কলি শেষ করে যতক্ষণ শেষ সুরটা কারখানার নানা শব্দে মিলিয়ে না যায় ততক্ষণ অপেক্ষা করে তবে আবার ধরে, যেন নিজের গলার শব্দ গাইয়ের বড়ো ভালো লেগেছে।

তোমাতে সঁপেছি আমার ভাগ্য
হে সুন্দরী! কেন অকারণ রাগ?
এসো, তোমার অধরে অধর রাখি
থেমে যাক কথার ঝামেলা।

'ইবাদ গাড়ি কিনেছে,' বলল ভালিদা।

'কী গাড়ি?' জিজ্ঞেস করল মেহ্‌রিবান।

'নতুন "মস্কভিচ"। ফিকে নীল রঙের। গাড়িটা কদিন চালাতে হবে। তারপর দুজনে বেড়াতে যাব।'

ওরা থেমে গেল। আবার ভরাট তীব্র সেই গলা ছিন্ন করল কারখানার একটানা আওয়াজ:

কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে, সোণার হরিণ?
ব্যথায় আমার মন পীত জর্জর,
দিন কাটে অধৈর্য অধীর,
রাত্রি নিদ্রাবিহীন, হে সুন্দরী!

মাহ্‌বুবার দিকে ঘুরে মেহ্‌রিবান জিজ্ঞেস করল:

'আর তোমার ব্যাপার সাপার কেমন? হানবালার সঙ্গে ঝগড়া চলেছে না ভাব?'

'ভাব...'

'তোমরা সুখী বটে।'

'আর তুমি?' ঝট করে শুধাল ভালিদা।

উত্তর না দিয়ে গান শুনতে লাগল মেহ্‌রিবান।

ফুলে আর জৌলুষ নেই,
কী বলেছি তোমায় বুঝি না?
কী ব্যথা দিয়েছে তোমার দোসর?
এখন নিরালায় বলো, হে সুন্দরী!

রাতে অপ্রত্যাশিত সেই মধুর মর্মস্পর্শী গান হঠাৎ থেমে গেল।

'কী, চুপ করে আছ কেন, মেহ্‌রিবান? তোমার ব্যাপার কেমন চলেছে?' ভালিদা ছাড়বার পাত্রী নয়।

নম্র হাসি হেসে মেহ্‌রিবান বলল:

'তোমরা সুখী হলে... মানে তোমাদের সুখে আমিও সুখী...'

'শোন, মেহ্‌রিবান,' বেশ ক্যাটকেটে গলায় বাধা দিয়ে বলল মাহ্‌বুবা, 'তোমার মনে আছে একদিন বলেছিলাম যে আমাদের রেওয়াজ হল সকলের জন্য একজন, একজনের জন্য সকলে?'

'মনে আছে।'

'তোমার কাছ থেকে তো আমরা কিছুই লুকোই না, তুমি তো আমাদের বন্ধু।'

'আমি কি কিছু লুকোচ্ছি?'

'লুকোচ্ছ বই কি!'

'কীসের কথা বলছ?'

নিজের স্বভাব মতো সরাসরি তার মুখে তাকিয়ে মাহ্‌বুবা বলল:

'একটা নাম করলেই যথেষ্ট: জাকির!'

মেহ্‌রিবানের মনে হল কথাটা থামাতে ওদের বলে, কিন্তু তার মানে কথাটা মেনে নেওয়া। ওদের কী বলতে পারে সে? বহুদিন সে নিজের স্বপ্নের সঙ্গে নিরালায় কাটিয়েছে, কারোকে

সে স্বপ্নের ভাগ দেওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণাকর। ইচ্ছে থাকলেও এ বিষয়ে কিছু সে বলতে পারত না। হৃদয়কে অনাবৃত করা সহজ নয়।

'কথাটার মানে কী?'

'জাকিরের সঙ্গে দেখা হয় তো?' অবসর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল ভালিদা।

মেহ্‌রিবানের অত্যন্ত বিব্রত লাগল।

'দেখা করি মানে?'

থেমে মাহ্‌বুবা ভালিদাকে বলল:

'চল যাই।'

'দাঁড়াও!..' মেহ্‌রিবানের মনে হল দুটো আগুনের মধ্যে পড়েছে। 'আমি ওর সঙ্গে সে ভাবে দেখা করি না... কয়েকবার শুধু একসঙ্গে কারখানায় ঘুরেছি।'

অভ্যাসমতো মাহ্‌বুবা বিশ্লেষণ শুরু করল:

'আচ্ছা, ধরা যাক, একটি মেয়ে রোজ কারখানায় একটি সুন্দর যুবকের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে...'

'হ্যাঁ, আর বড়ো কথা হল, কখন, না যখন লোকটা কাজে থাকে,' বলল ভালিদা।

'অর্থাৎ, কাজের সময়। কেন মেয়েটি এমন করে, তোমার মতে?'

'আমার মতে? আমার মতে, মেয়েটাও চায় ডিপার্টের ম্যানেজার হতে,' চট করে বলল ভালিদা।

দুজনেই হেসে উঠল।

'হেস না,' মুখ তুলে মেহ্‌রিবান বলল, 'আমি এতদিন কথাটা গোপন রেখেছি...'

রেগে মাহ্‌বুবা ঘুরল তার দিকে:

'গোপন রেখেছ? গোপন রাখার ছিরি বটে! কারখানার সবাই তোমাকে নিয়ে বলাবলি করে!'

'এমন দিন আসবে যখন শুধু আমাকে নিয়ে নয়, তোমাদের নিয়েও বলবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভালিদা নিচের ঠোঁটটা ওলটাল অবজ্ঞাভরে:

'আমাদের নিয়ে? আমরা এমন কী করেছি, শুনি? আমাদের কোনো ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। ইবাদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাতের কথা আমি চেপে যাই না আর মাহ্‌বুবা অস্বীকার করে না যে হানবালাকে ভালোবাসে। যাই হোক, আমরা অন্তত ইবাদ আর হানবালাকে নিয়ে কাজের সময় সারা কারখানায় ঘুরি না।'

'আমি তা বলছি না,' সংযতভাবে তাকে শুধরে বলল মেহ্‌রিবান, 'আমি একেবারে অন্য একটা কথা বলছি, ভালিদা!'

দুজনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল:

'কী কথা?'

'আমি জাকিরকে বলি যেন আমাকে কারখানাটা চিনিয়ে দেয়, কী ভাবে কাজ চলে বুঝিয়ে দেয়। এক্‌স্‌চেঞ্জে অন্যভাবে, নতুনভাবে আমি কাজ করতে চাই।'

খিক খিক করে হাসল দুজন।

মাহ্‌বুবা আগ্রহ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'জানতে পারি নতুনটা কী?'

'নিশ্চয়। প্রথমে ভেবেছিলাম কিছু ফয়দা হবে না, তাই কিছু বলিনি। কিন্তু গত কয়েক দিনে চেষ্টা করে দেখলাম কাজ দিচ্ছে বেশ।'

মেয়েদুটির মুখে ঠাট্টার জায়গায় এল কৌতূহলের ভাব।

'আমাদের এক্‌স্‌চেঞ্জ থেকে আমরা সমস্ত কারখানাটাকে চালাই বলা যায়। প্রায়ই তো এমন হয় যে, যাকে ফোনে চায় সে নেই। তখন আমরা শুধু বলি: "জবাব দিচ্ছে না" বা "বেরিয়ে গেছে"। কোথায় গেছে জানা নেই। তার মানে, জরুরী আর গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত ঘটে, গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্নের সময় মতো মীমাংসা হয় না। কাজ আটকে যায়। মাঝে মাঝে তো দুর্ঘটনা পর্যন্ত হতে পারে। তোমরা তো একদিন শুনেছ টিউব, বয়লার ব্যবস্থায় দৈবক্রমে তেলের সঙ্গে জল মিশলে জলবিন্দু কতগুণ বেড়ে যায়? ১,৭০০ গুণ...'

সারা রাস্তা বান্ধবীদের মেহ্‌রিবান বোঝাল কেমন করে টেলিফোনের কাজ অন্যভাবে করার ইচ্ছে তার মনে জাগে, কীভাবে কারখানার বিষয়ে শেখাবার জন্য জাকিরকে রাজী করায়, বুঝিয়ে দিতে বলে ডিপার্ট আর বিভাগগুলির যোগাযোগ সূত্র। কারখানার বিষয়ে তার ধারণা আর পর্যবেক্ষণের

কথা মেহ্‌রিবান বলল, নিজের ছকটা পরের দিন তাদের দেখাবে বলে কথা দিল...

কারখানায় সমগ্রভাবে টেলিফোনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি ছিল মেহ্‌রিবানের সহজ বক্তব্যে; তাই মাহ্‌বুবা ও ভালিদা ভেবে দেখল ব্যাপারটা। হেসে বলল মাহ্‌বুবা:

'খুব শীগগিরই সড়গড় হয়েছে দেখছি! কথাটা বেশ!'

প্রতিবাদ করে মেহ্‌রিবান বলল:

'না, মাহ্‌বুবা, এতে অসাধারণ কিছু নেই। বেশির ভাগ পাকা টেলিফোনের মেয়েই এভাবে কাজ করে। শুধু ওদের এটা রপ্ত হয় আপনা থেকে, অনেকদিন কাজ করে নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে বেশ ভালো করে চেনার পর। এটাকে ওরা এমন কিছু অসাধারণ একটা পদ্ধতি মনে করে না। যেমন, আমাদের সিমুজারও কাজ করে এভাবে, তার মতে এটা একেবারে স্বাভাবিক। ও হয়ত ধরে নিয়েছে যে আমরাও এটা শিখে নেব, হয়ত শিখব দেরিতে। কিন্তু আমরা এখনি শুরু করতে পারি, মাস তিনেকের মধ্যে, হয়ত এক মাসেই শিখে নিতে পারি।'

মেহ্‌রিবান ও জাকিরের সম্পর্কটা প্রেমের, এ সন্দেহ কিছুটা কাটল মেহ্‌রিবানের কথায়। কিন্তু মেহ্‌রিবানের হাবভাবে এমন একটা কিছু ছিল যাতে মেয়েরা বুঝল যে সে তাদের সব কথা খুলে বলে না।

প্রায়ই জামিলিয়াকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সোফায় বসে

ভালিদা বা মাহ্‌বুবা দেখত যে মেহ্‌রিবান টেলিফোনে কার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে। এ সময়ে আনন্দে তার মুখ জ্বলজ্বল করতে থাকে। কানে অবশ্য কিছু আসে না: প্রেম মেহ্‌রিবানের সতর্কতাবোধকে নিখুঁত করেছে, আলাপের লোকের সঙ্গে এত মৃদুকণ্ঠে কথা বলে যে স্বরটা মনে হয় পাতার ফিসফিসানি। তাই জাকিরের সঙ্গে সে কারখানায় না ঘুরলে কারো কিছু নজরে পড়ত না।

কিন্তু মেহ্‌রিবান ও জাকির তো জনহীন দ্বীপে থাকে না।

একদিন বেশ সন্ধ্যেবেলায় হানবালার সঙ্গে মাহ্‌বুবা সমুদ্রতীরের নতুন বুলেভারে ঘুরতে ঘুরতে উইলোগাছের নিচের বেঞ্চিতে মেহ্‌রিবান ও জাকিরকে দেখে। না দেখার ভান করে সে হানবালাকে অন্য একটা বীথিতে নিয়ে গেল। তার চোখে পড়ল যে তারা আসতেই মেহ্‌রিবান তাড়াতাড়ি জাকিরের বুকে মুখ লুকোয়। সে বুঝল যে এ নিয়ে মেহ্‌রিবানের সঙ্গে কথা বলা অনুচিত। আর মাহ্‌বুবা কিছু বলল না দেখে মেহ্‌রিবান ধরে নিল সেই সন্ধ্যায় তারা ওদের দেখেনি; মনটা ঠাণ্ডা হল।

১১

নতুন ভাবে কাজ করা যাক, মেহ্‌রিবানের এই প্রস্তাবে টেলিফোনের মেয়েরা সাড়া দিল বিভিন্নভাবে। যারা অতিরিক্ত ঝামেলা আর অধ্যয়নে ভয় পায় না তারা খুশি। সবচেয়ে খুশি

হল কিন্তু নানা ডিপার্ট ও বিভাগের কর্মীরা। মেহ্‌রিবানের ছকটা ডিরেক্টর জেনে নিয়ে নক্‌সা বিভাগে নির্দেশ দিল যেন সেটাকে বড়ো করে কপি করা হয়।

কপি তৈরি হলে নক্‌সা-কারিকা ফোন করে মেহ্‌রিবানকে বলল সেটা নিয়ে যেতে।

মেহ্‌রিবান তার জায়গায় জামিলিয়াকে বসতে বলে ছুটল নক্‌সা বিভাগে।

বছর বিশেকের একটি সুঠাম সৌখীন মেয়ে ঝকঝকে লাল নখওয়ালা দীর্ঘ আঙুলে রবার ধরে নক্‌সাটার পেন্সিলের দাগগুলো তুলছিল, তার ফলে ইন্ডিয়ান কালির রেখাগুলো আরো ফুটে উঠছে।

ছকটা কপি করার কাগজে কী সঠিক নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে, কী রকম পাকাপোক্ত আর জমকালো চেহারা হয়েছে দেখে মেহ্‌রিবানের মন আনন্দে ও গর্বে ভরে গেল। কৃতজ্ঞ ও উত্তেজিতভাবে বলে উঠল সে:

'বা, কী সুন্দর হয়েছে! আপনাকে কী করে ধন্যবাদ দিই জানি না!'

সুঠাম শরীরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠ দিয়ে কপাল থেকে অলকগুচ্ছ সরাল মেয়েটি। চেহারাটা কী সুন্দর! পুতুলের মতো নিষ্প্রাণ আদর্শ সৌন্দর্য নয়, এ সৌন্দর্য জীবন্ত, উষ্ণ, লোকের মন-ভোলানো, বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। নক্‌সা-কারিকা জারাঙ্গিস'এর রূপে কারখানার অনেকে মুগ্ধ।

মেহ্‌রিবানকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জারাঙ্গিস একটু তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞেস করল:

'তুমি কি নিজে এটা এঁকেছ?'

'না, আমাকে সাহায্য করেছে...'

'কে?'

'একটি ছেলে।'

বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে জারাঙ্গিস জিজ্ঞেস করল:

'লোকটি কে জানতে পারি?'

'কেন বলুন তো?' সহজভাবে বলল মেহ্‌রিবান। 'জাকির জালালভ।'

চমকে উঠল জারাঙ্গিস।

'কী বললে?'

'জাকির জালালভ,' আবার বলল মেহ্‌রিবান।

'চার নং ডিপার্টের ম্যানেজার?'

'হ্যাঁ... কেন?'

'কিছু না... তোমার নাম কী?'

'মেহ্‌রিবান। আর আপনার?'

'জারা।'

গোল করে জড়ানো নক্‌সাটা নিয়ে মেহ্‌রিবান আবার কৃতজ্ঞতা জানাল:

'অনেক ধন্যবাদ! আপনার যেমন চেহারা তেমন কাজ।'

নক্সাটা বুকে চেপে দরজার দিকে গেল মেহ্রিবান।

'এক মিনিট!' নক্সা-বোর্ডের কিনারায় বঙ্কিম উরুতে হেলান দিয়ে বুকে দু হাত জুড়ে রেখে ডাকল জারাঙ্গিস:

'জাকিরের সঙ্গে তোমার বুঝি দহরম মহরম?'

অবাক হয়ে মেহ্রিবান বলল:

'তার মানে?'

বিদ্রুপভরে নিচের পুরু ঠোঁটটা ওলটাল জারাঙ্গিস:

'হুঁ... তোমার বয়স কত?'

'আঠারো...'

'কথাটা মাথায় ঢোকেনি আবার! মিছিমিছি কেন ধাপ্পা মারছ?'

'সত্যি, আমি বুঝতে পারছি না। আপনি কী বলতে চান?'

জারাঙ্গিসের মুখে এল উদ্ধত কঠোর একটা ছাপ। বেশ স্পষ্ট ও অভব্যভাবে সে বলল:

'দেখ, বাচ্চা পয়দা না হয়!'

মেহ্রিবানের মুখ গনগনে লাল হয়ে উঠল। টেবিলে নক্সার কপিটা ছুঁড়ে ফেলে আসলটা তুলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। এত জোরে দরজাটা বন্ধ করে দিল যে আর একটু হলে কাচ ভেঙে পড়ত।

পিছনে শোনা গেল জারাঙ্গিসের উচ্চ হাসি।

...জাকিরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের সময় মেহ্রিবান জারাঙ্গিসের কথা ঘুণাক্ষরে বলল না। তাছাড়া সুন্দরী বদ

মেয়েটি যা বলেছে সেটা মুখে আনতে তার বাধে। কিছু না বললেও কিন্তু মেহ্‌রিবানের অন্তরে একটা চাপা অশান্তি রয়ে গেল, চোখে মাঝে মাঝে আবার সেই বিষণ্ণ ভাবটা ফিরে আসে। তাই কাজ করে এখন সে অনেক আনন্দ পায়। সব সিফ্‌টের মেয়েরা তার ছক দেখে শিখে নতুন ভাবে কাজ শুরু করেছে। সিমুজার তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাড়তি কাজে যারা ঘাবড়ায় তাদের সে বুঝিয়ে দিত কারখানার ভেতরকার যোগাযোগের ব্যাপারে কতটা কাজ দেয় নতুন পদ্ধতিটি।

কারখানার কাগজে ছবিসুদ্ধ মেহ্‌রিবানের বিষয়ে লেখা বেরোল। ছোট্ট যে মেয়েটিকে কেউ লক্ষ্য করেনি, লোকচক্ষুর আড়ালে যে এতদিন টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জের একটা কোণে পড়েছিল, তার নাম এখন জানল কারখানার সকলে। কারখানার টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ উন্নত হল। এখন যাকে চায় তাকে বেশ তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করা সম্ভব। এতে কর্মদিনের বহুমূল্য মুহূর্তগুলির অপচয় কমল।

কয়েক বার জাকির এল না দুজনের মিলনস্থলে। দেখা হলে মেহ্‌রিবান অনুযোগ করত, তখন সে তুলত জরুরী কাজের কথা। শেষের দিকে দেখাসাক্ষাৎটা হত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বেঞ্চিতে বসতে না বসতেই ঘড়ির দিকে তাকাতে শুরু করছে জাকির, এটা দেখে মেহ্‌রিবানই প্রথমে উঠে পড়ত যাবার জন্য আর জাকির তাতে বাধা দিত না, বলত না আর একটু বসে যেতে।

একদিন মেহ্‌রিবান একমনে কী একটা বলছে, জাকির ঘড়ির দিকে তাকাল। তৎক্ষণাৎ কথা বন্ধ করে মেহ্‌রিবান উঠে দাঁড়াল। কেন জানি জাকির কিন্তু বসে রইল। মেহ্‌রিবান জিজ্ঞেস করল:

'কাল দেখা হবে?'

'না।'

'কেন?'

দাঁড়িয়ে জাকির একটা সিগারেট ধরাল।

'কাল থেকে তিন নং যন্ত্রাগারটা ভাঙা হবে। আমাকে সেখানে থাকতে হবে সর্বক্ষণ, এমনকি সন্ধ্যেবেলাতেও। ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নিজের চোখে দেখা দরকার যাতে ওরা গণ্ডগোল না করে বসে।'

'তাহলে কাল ওখানে যাব। ওদের কাজ দেখব, তোমাকেও দেখতে পাব।'

'বেশ তো।'

'এবার চলা যাক?'

মনে হল জাকির কী একটা ভাবছে। সিগারেটে আর একটা জোর টান দিয়ে ধোঁয়াটা উপরে ছেড়ে প্রয়াস করে বলল:

'আজ তোমাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারব না, মেহ্‌রিবান। মানসুরভের কাছে এখ্‌খুনি যেতে হবে। না, এখনো সময় আছে, ন'টা বাজেনি। চল, ট্রলিবাস পর্যন্ত যাওয়া যাক...'

প্রিয়র মুখের দিকে তাকাল মেহ্‌রিবান, কী একটা যন্ত্রণাকর প্রশ্নের জবাব যেন চায়। উত্তর মিলল না।

'বেশ, চল,' মৃদুকণ্ঠে সে বলল।

পরের দিন সাত-সকালে উঠে মেহ্‌রিবান তাড়াতাড়ি গেল কারখানায়। তিন নং ডিপার্টের প্রাঙ্গণে এল। সবকিছু চুপচাপ, চুল্লিগুলো নিভনো, পাম্পগুলো স্তব্ধ। হাতে প্রকাণ্ড চাবি নিয়ে দুটি ফিটার পাম্পগুলো খুলে ফেলছে। প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো ট্র্যাকটর থেকে ইস্পাতের তার গিয়েছে যন্ত্রচালনার পুরনো দালানে; দালানটা ইতিমধ্যে হেলে পড়েছে।

উদ্দেশ্যহীন ভারি পায়ে যন্ত্রাগারটির চারদিকে ঘুরছে হাকিম দাদাশ। যেন বন্ধুর শেষকৃত্যের জন্য তৈরি হচ্ছে সে। নিশ্বাস নিয়ে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে চুল্লি আর পাইপের ঠান্ডা গায়ে হাত দিয়ে দেখছে। অফিস থেকে আসবাবপত্র বের করে আনছে কমবয়সীরা, তাদের ভার নাইলিয়ার হাতে। একটি ছোকরা সোনালি ফ্রেমে বাঁধা "স্মোলনিতে লেনিন" নামের ভারি ছবিটি বুকে চেপে বেরিয়ে এল।

'দাঁড়া!' হাকিম দাদাশের খড়খড়ে গলা শোনা গেল। 'আমার ইলিচকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

'নতুন যন্ত্রাগারের আরো ভালো কামরায় টাঙিয়ে দেব,' সোৎসাহে চেঁচিয়ে বলল ছোকরাটি।

'বেশ, বেশ! কিন্তু দেখ, বেশ ভালোভাবে যেন রাখা হয়!'

নাইলিয়ার ভরাট গলা শোনা যাচ্ছে সর্বত্র। দূর থেকে মেহ্‌রিবানকে দেখে সে চেঁচাল:

'সেলাম, মেহ্‌রি! এখন থেকে তৈরি হয়ে থেকো, নতুন যন্ত্রাগারে পুরনোর চেয়ে পাঁচগুণ বেশি টেলিফোন থাকবে কিনা!'

মেহ্‌রিবান হাত নাড়ল তার দিকে। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল ফটকে। জাকির এসেছে, সঙ্গে একটি প্রবীণ লোক, স্থপতি খুব সম্ভব। কিন্তু মেহ্‌রিবান দেখল শুধু জাকিরকে। সেও তাকে দেখে দূর থেকে নমস্কার জানাল, কিন্তু কাছে এল না। সঙ্গে সঙ্গে জাকিরের চারদিকে কর্মীরা ভিড় করে দাঁড়াল, সে নানা নির্দেশ দিতে লাগল।

যন্ত্রাগারের প্রাঙ্গণে ভয়ানক ব্যস্ততা। কিন্তু একটা জিনিস অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক — কেউ এল না হাকিম দাদাশের কাছে। প্রাণহীন পাথরের মতো সে একপাশে বসে আছে, কেউ তার পরামর্শ চায় না, বরং তার এবং ইমামভের্দির চোখে চোখ রাখতে ভয় পেয়ে সবাই যেন সরে পড়ছে। ইমামভের্দি হাকিম দাদাশের পাশে বসে আছে। জাকির তো বুড়োদের দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করল না। উচ্চ কণ্ঠে সে আদেশ দিল:

'লাগাও এবার!'

ট্র্যাক্টরের আওয়াজ, ইস্পাতের মোটা তারগুলো বেহালার তারের মতো টান টান হয়ে উঠেছে, ঝনঝন চড়চড় শব্দ, শিরদাঁড়া শিরশির করে ওঠে। মাটি যেন এধার ওধার দুলে

উঠল, ভারসাম্য হারিয়ে দালানটা বিকট শব্দে মাটিতে পড়ল। ঝাঁঝালো ধুলোর ভারি মেঘ উঠে ঢেকে দিল সবকিছুকে। মেহ্‌রিবানের মনে দুঃসহ একটা প্রভাব বিস্তার করল নির্দেশ-দেওয়া নানা গলার আওয়াজ, চীৎকার, লোহা আর ভাঙা কাঁচের ঝনঝন, নিশ্চল বসে থাকা দুই বুড়োর বিষণ্ণ মুখ। পাথরের মতো সে দাঁড়িয়ে আছে প্রাঙ্গণের মাঝখানে, একেবারে লোকের পথে। তারা তার গা ঘেঁষে যাচ্ছে, ধাক্কা দিচ্ছে, কিন্তু তার হুঁশ নেই, হাকিম দাদাশ ও ইমামভের্দির উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

বৃদ্ধদুটি বেড়ার নিচে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যাওয়া প্রকাণ্ড একটা পাইপের উপর চুপ করে বসে আছে। হঠাৎ ইমামভের্দি পকেট থেকে ভদকার একটা ছোট্ট বোতল বের করে তলায় ধাক্কা দিয়ে ছিপিটা খুলল। ঠিক সে মুহূর্তে মুখর লোকের ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে নাইলিয়া তার হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নিল।

'আপনি কী, ইমামভের্দি! আপনার খাওয়া বারণ।'

ভাঙা গলায় বলল ইমামভের্দি:

'নাইলিয়া! নাইলিয়া! শোক করে একটু খাব, তাও দেবে না!'

'লজ্জা করে না আপনার, ইমামভের্দি!' চেঁচিয়ে বলে নাইলিয়া যন্ত্রচালনাঘরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে

দিল; ভাঙা কাচের ঝনঝন মিলিয়ে গেল অন্যান্য শব্দের সঙ্গে।

আবার কানে এল ভেঙে পড়া দেয়ালের ভারি শব্দ। চমকে উঠে দাঁড়াল ইমামভের্দি, কিন্তু হাকিম দাদাশ তাকে টেনে বলল:

'কী দরকার, ইমামভের্দি!'

বাধ্য ছেলের মতো বসে পড়ল ইমামভের্দি।

কুঁজো হয়ে বসে থাকা বৃদ্ধদের দিকে জাকির আগেকার মতোই ভ্রূক্ষেপ না করে তাদের পেরিয়ে অফিস দালানের দিকে চলে গেল।

"সত্যি, ও বড়ো নিষ্ঠুর!" ভাবল মেহ্‌রিবান, তার নাসারন্ধ্র কেঁপে উঠল। "কাছে এসে কথা বলে সান্ত্বনা তো দিতে পারে! এরা তো সারা জীবন এখানে খেটেছে..." নিজে সে দৃঢ় পায়ে তাদের কাছে গিয়ে ইমামভের্দির পাশে পাইপের উপর বসে তার হাঁটু ছুঁয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল:

'ইমামভের্দি চাচা!'

নাক ঝেড়ে চোখ কুঁচকে বৃদ্ধ তাকাল তার দিকে। মেয়েটির মুখে সস্নেহ হাসি।

'আমাকে চিনতে পারছেন না, ইমামভের্দি চাচা!'

মাথা নাড়িয়ে বৃদ্ধ জানাল চিনতে পারছে না।

'মনে আছে, সেদিন আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম,

আর আপনি আমার চুল ঘেঁটে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বুঝি হাতে কলমে কাজ শিখতে এসেছ?"'

'এখন কিছু মনে পড়ছে না বাছা...'

'আমি মেহ্‌রিবান, ইমামভের্দি চাচা। মেহ্‌রিবান, মেহ্‌রি... টেলিফোনে কাজ করি।'

'টেলিফোনের সমস্ত যন্ত্র ওরা খুলে নিয়েছে। আর তো টেলিফোনে তোমার সঙ্গে কথা হবে না।'

'ও কিছু নয়! নতুন টেলিফোন বসাবে, আবার আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। জানেন, আপনাদের গলা আমি চট করে ধরতে পারি, আপনার গলা আর হাকিম দাদাশের, উনি যখন বলেন "লক্ষ্মী মেয়েটি, আমাকে এই লাইনটা দাও তো," তখন বুঝি যে ব্যাপারটা খুব জরুরী।'

ধুলোয় ধূসর মাথা নেড়ে হাকিম দাদাশ ধীরে ধীরে বলল:

'বাছা, আমাদের গলা আর শুনতে পাবে না। আমাদের গলা সবাই ভুলে যাবে, তুমিও।'

হেসে উঠল মেহ্‌রিবান:

'কী যে বলছেন, হাকিম চাচা! আপনারা কত বিশেষজ্ঞকে তৈরি করেছেন, যারা এখানে হাতে কলমে কাজ শিখেছে তারা আপনাকে ভুলবে কী করে? ওদের গলা কি আপনাদেরই গলা নয়? সারা কারখানায় সবচেয়ে সুখী লোক তো আপনারা! এখানকার আর সব যন্ত্রাগার আপনাদের নয়? ওখানে যারা কাজ করে তারা তো আপনাদের কাছেই শিখেছে। আর এখানে,

নতুন যন্ত্রাগারে যারা কাজ করবে তারা তো আপনাদের হাতে গড়া। কমবয়সী মিস্ত্রী আর ইঞ্জিনিয়রদের কতবার বলতে শুনেছি: "আমি তিন নং যন্ত্রাগারে কাজ শিখেছি হাকিম দাদাশ আর ইমামভের্দির কাছে।"'

হাকিম দাদাশের ঠোঁটে বিষণ্ণ একটা হাসি ফুটে উঠল। মেহ্‌রিবানের মনে হল ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছে। বুঝে খুশি লাগল।

'কিন্তু দেখুন, এখানে ধুলোয় বসে বসে পুরোনো দেয়ালের ভেঙে পড়া দেখা আর যন্ত্রণা পাওয়াটা কি ভালো? উঠুন, চলুন আমার সঙ্গে!'

বৃদ্ধদের ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখ প্রশ্ন করল: "কোথায়?"

'চলুন, অন্যান্য ডিপার্টে আর যন্ত্রাগারে যাই! সেখানে আপনাদের পুরোনো ছাত্ররা কাজ করছে। এখন আবার ওদেরো ছাত্র হয়েছে। তার মানে — আপনারা হলেন দাদা! কারখানায় যারা কাজ করে, সবাইয়ের, সমস্ত কারখানার দাদা!'

বাচ্চা মেয়ের মতো দুজনের হাত ধরে মেহ্‌রিবান হাসতে হাসতে টানতে টানতে তাদের নিয়ে গেল ফটকের দিকে, ফটক পেরিয়ে রাস্তায়।

সূর্য যেন হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে জ্বলে উঠল অবসন্ন বৃদ্ধদের সামনে...

ঠিক সে সময় যন্ত্রাগারের প্রাঙ্গণ থেকে ভেসে এল বিকট ঝনঝন শব্দ। ইমামভের্দি থমকে দাঁড়াল।

'চুল্লিগুলো...' বলে উঠে পিছনে ফিরল সে। পথ আটকা পড়ল তেলট্যাঙ্কের দীর্ঘ সারিতে। কালিঝুল মাখা চকচকে মুখ বুড়ো ইঞ্জিনড্রাইভার আর তার সহকারী একটি যুবক ক্যাপ নাড়িয়ে চেঁচাল:

'সেলাম, ইমামভের্দি! সেলাম, হাকিম!'

বৃদ্ধরা চিনত না এদের, কিন্তু প্রতিনমস্কার জানাল। তেলট্যাঙ্কের যেন শেষ নেই, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। শেষ পর্যন্ত সারির শেষ দিকটা নজরে পড়ল। পেছনে আর একটা ইঞ্জিন লাগানো, সে ইঞ্জিন থেকেও চেঁচিয়ে বৃদ্ধদের সেলাম জানাল লোকে। খটখট শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল, মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল তেলট্যাঙ্কের দীর্ঘ লাইন। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ইমামভের্দি, কেন জানি না পুরনো ভেঙে ফেলা যন্ত্রাগারের প্রাঙ্গণে আর ফিরল না।

১২

মেহ্‌রিবানের নতুন বান্ধবীরা বিভিন্ন চরিত্রের লোক, কিন্তু একটা সাধারণ গুণ তাদের মধ্যে বর্তমান: সবাই আন্তরিক। সবাই ভালো। কারখানায় শুধু একটি মানুষ মেহ্‌রিবানের মনে অশান্তির একটা এলোমেলো ভাব, অবোধ্য একটা অস্থিরতা আনে — সে হল নক্‌সা-কারিকা জারাঙ্গিস। সুন্দরী মেয়েটির প্রতি তার এমন অদ্ভুত বিরাগ কেন? এর মূলে কি সেই প্রথম

সাক্ষাতের ছাপ না অন্য কোনো, আরো গোপন কোনো কথা? হ্যাঁ, মেহ্‌রিবান ভয় পেয়েছিল। তার মনে হত কে যেন তার কাঁধে নাড়া দিয়ে কানে কানে বলছে, "সাবধান, মেহ্‌রিবান, সতর্ক হয়ে থেকো, মেহ্‌রিবান! নিজের সুখ রক্ষা করা আর দরকার হলে তার জন্য লড়াই করা চাই!" কিন্তু এখন পর্যন্ত তো ভয়ানক কিছু ঘটেনি। সত্যি বটে, গত কয়েক দিনে জাকির বেশ বদলে গেছে, কিন্তু মেহ্‌রিবান নিজেকে বোঝায় যে তার কারণ এখন সে নতুন যন্ত্রাগার নির্মাণের ব্যাপারে ডুবে আছে, হাতে সময় নেই, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। জাকিরের কাছে যন্ত্রাগারটা কত প্রিয় সে অনুভব করে, আদর করে জাকির বলত এটা হল "আমাদের ডিপার্টের ক্ষুদে বাচ্চা"। জাকিরের পরিবর্তনের কারণ যদি বাস্তবিক এটাই, তবে ভয় পাবার কী আছে, কার হাত থেকে নিজের সুখকে রক্ষা করা দরকার? তবু মাঝে মাঝে বুকটা কেন কেঁপে ওঠে, অমঙ্গলের পূর্বাভাষে যেন?

...মেহ্‌রিবান আর জারাঙ্গিস প্রায় একই সময় কারখানায় ঢোকে।

কারখানায় জারাঙ্গিস আসার দিনেই তার সঙ্গে আলাপ হয় জাকিরের। তখনি নতুন যন্ত্রাগার নির্মাণ নিয়ে কথাবার্তা চলেছে। যন্ত্রাগারের অভ্যন্তরের খুঁটিনাটির নক্‌সা স্থপতির জন্য তৈরি করছিল জাকির। কালিতে আঁকা নিজের ছকগুলো সে নক্‌সা-বিভাগে দিত কপি করার জন্য।

একদিন ও বিভাগের কাচের দরজা খুলে সোজা ম্যানেজারের কামরায় জাকির যাচ্ছে, হঠাৎ কীসে যেন তাকে থামিয়ে দিল, অন্তর থেকে কে যেন জোরে তাকে বলল: "ফের!" ফিরে দাঁড়িয়ে সে নিঃসাড় হয়ে গেল। জারাঙ্গিসের স্থির শীতল দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হল। জারাঙ্গিসের সাধারণ ও সংযত বেশভূষায় রুচির স্পষ্ট ছাপ। তার আশ্চর্য রূপ জাকিরকে হতবুদ্ধি করে দিল। ভদ্রভাবে নমস্কার জানিয়ে সে হয়ত জানতে চাইত জারাঙ্গিস কে, এখানে কী করে, কিন্তু জারাঙ্গিস এমন নিস্পৃহভাবে মাথা নাড়ল যে জাকিরের গলায় কী যেন আটকে গেল। অনিশ্চিতভাবে মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে সে দ্রুতপায়ে গেল ম্যানেজারের কামরায়।

ম্যানেজার জারাঙ্গিসকে ডেকে জাকিরের নক্সার কপি করতে বলল। অসন্তুষ্ট মুখে জারাঙ্গিস জাকিরের হাত থেকে নক্সাখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সেদিন থেকে নানা ছুতোয় প্রায়ই জাকির হাজির হত নক্সা-বিভাগে। তার সঙ্গে জারাঙ্গিসের ব্যবহার আগেকার মতোই নিস্পৃহ, সরকারী ভাব একটা। শেষে একদিন জাকিরের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল:

'কমরেড জালালভ, আপনি এখানে বড্ডো বেশি আনাগোনা শুরু করেছেন!'

দুষ্টু ছেলের মতো হকচকিয়ে গিয়ে জাকির নতুন নির্মাণ কার্যের কথা তুলল, এ কাজের অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে তার

মনে শান্তি নেই, ইত্যাদি। যেন মেয়েটির কাছে সাফাই গাইছে। কিন্তু জারাঙ্গিস তার কথায় কর্ণপাত করছে না দেখে মাপ চেয়ে বেরিয়ে গেল।

জারাঙ্গিস উল্লসিত — গোড়াপত্তন তাহলে হয়েছে।

এরপর থেকে জাকির তার সেক্রেটারির হাতে নক্‌সা পাঠায় নক্‌সা-বিভাগে। সেক্রেটারির কাছ থেকে সুকৌশলে এবং সতর্কভাবে জারাঙ্গিস জাকিরের বিষয়ে জানবার যা আছে জেনে নিল। জানল যে সে কারখানার অন্যতম প্রধান ও দক্ষ কর্মী, তার ওপর আবার অবিবাহিত। এ সময়টা জাকির ও মেহ্‌রিবান সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা কাটাত পার্কে নিজেদের সেই বেঞ্চিটায়। প্রেমের উচ্ছ্বাসে দুজনে ভাবত যে তাদের মতো সুখী লোক দুনিয়ায় আর নেই।

কারখানার স্টোকার বুলগেইজের সঙ্গে জাকির ও মেহ্‌রিবানের সেই দেখা হবার দিনটা থেকে যেসময় বুলগেইজেব প্রশ্নে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে মেহ্‌রিবান তার এক হপ্তা আগে জারাঙ্গিস জাকিরের দরকারী নক্‌সাটা ঠিকমতো কপি করে নিজেই নিয়ে আসে। প্রশস্ত আলোকিত কামরায় সে ঢোকাতে জাকির আপনা থেকে উঠে দাঁড়াল, নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না। জারাঙ্গিস সহজভাবে নমস্কার জানিয়ে কামরাটা একবার দেখে নিয়ে দেয়ালজোড়া বিরাট জানলাটার কাছে এল। প্রাঙ্গণে শব্দমুখর বিরাট যন্ত্রাগারটার দিকে তাকিয়ে বলল:

'আপনি তো মন্দ থাকেন না। এখান থেকে দৃশ্যটা চমৎকার — আপনার ডিপার্টের সবটা যেন হাতের মুঠোয় রয়েছে।'

'বলে না, চটক আছে খুব,' না হেসে ঠাট্টা করে বলল জাকির। তার নিস্পৃহ ধরনে অবাক লাগল জারাঙ্গিসের। কিন্তু তাতে যে সে খুব বিব্রত তা মনে হল না।

এরপর থেকে প্রতিদিন চার নং ডিপার্টের ম্যানেজারের কামরায় দেখা যেত জারাঙ্গিসকে।

জাকির নিজেকে প্রবোধ দিল এই বলে যে মেয়েটির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু নিজেরি অলক্ষিতে সে জারাঙ্গিসের আগমন বা টেলিফোনের আশায় থাকত প্রতিদিন। জারাঙ্গিসের বাঁকা বাঁকা কথা আর ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি, তার সুন্দর উচ্ছল দেহ অধীর করে দিল তাকে, অন্তরে শুরু হল তোলপাড়। তবু সে নিজেকে বাধা দেবার চেষ্টা করত, চেষ্টা করত মেহ্‌রিবানের প্রতি তার শুচি মনোভাবকে বাঁচিয়ে রাখতে, কিন্তু প্রতিদিন নিজের অস্তিত্বের অতল থেকে প্রচণ্ড অনুভূতি আর বাসনা প্রকট হয়ে উঠে তাকে জর্জরিত করে দিল। মেহ্‌রিবান স্বপ্নের মতো মধুর, স্রোতস্বিনীর মতো পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা, আর জারাঙ্গিস তপ্ত আকাঙ্ক্ষার জিনিস। জীবনের মতোই। মেহ্‌রিবানের কথা মনে হলে তার যে অনুভূতিটা হত সেটা পবিত্র ও শুভ। মেহ্‌রিবানের প্রতি তার অনুরাগ গভীর, সে অনুরাগ বিহঙ্গের মতো মুক্তপক্ষ,

কিন্তু সে গভীরতার মধ্যেই অনির্দিষ্ট ও আবছা কী একটা আছে। এই অপরূপ শুদ্ধ সম্পর্কের পরিণতি কী হতে পারে সে কথা একবারও নিজেকে জিজ্ঞেস করেনি, সত্যি বলতে, এ বিষয়ে কখনো স্থির চিত্তে ভেবে দেখেনি। অথচ জারাঙ্গিসকে বোঝা যায়, তাকে কামনা করা যায় কত সহজে!

এ কদিন মেহ্‌রিবানের সঙ্গে তার সম্পর্কে একটা অনিশ্চিত অস্থির ভাব এসেছে এই মনোভাবের ফলে। হয়ত তাই বুলগেইজের সরল প্রশ্নের জবাব দিতে সে পারেনি...

দুটি পরস্পরবিরোধী অনুভূতির সংঘাতে তার অন্তর বিক্ষুব্ধ। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল এ ভাবে আর চলবে না। একদিন জারাঙ্গিসকে বলল:

'আজ থেকে সব নক্‌সা আমার সেক্রেটারিকে দেবেন।'

অবাক হয়ে জারাঙ্গিস জিজ্ঞেস করল:

'কেন বলুন তো?'

'আপনি মিছিমিছি কেন কষ্ট করবেন।'

মাথা নাড়ল জারাঙ্গিস, কপাল থেকে চুল সরাল, কাঁধ ঝাঁকাল। ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়াল জাকির।

'আপনি এখানে বড্ডো ঘনঘন আসেন।'

কথাটা অপমানকর কিন্তু জারাঙ্গিসের ভ্রূক্ষেপ নেই। হেসে বলল:

'আমাকে কাজ দেবেন না, কাজ না দিলে আর আসব না!'

'আপনি এখানে এসেছেন কাজ করতে। আর নতুন নির্মাণ কার্যের ব্যাপারে শীগগিরই আপনাকে অনেক বেশি খাটতে হবে।'

'তাহলে?' এবার গম্ভীর সুরে শুধাল জারাঙ্গিস। 'আপনার মূল নক্সায় অনেক কিছু থাকে যা আমার মাথায় ঢোকে না। আমি তো বেশি দিন কাজে ঢুকিনি... মাঝে মাঝে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার...'

'যদি কিছু না বোঝেন, আমাকে ফোন করবেন, আমি নিজে যাব। আচ্ছা, আসুন এবার!'

কথা শেষ হয়েছে ভেবে নক্সাগুলো জাকির অগ্নিনিরোধী আলমারিতে তুলে রাখল। তারপর ভারি দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল। তার পেছন দিকে চেয়ে জারাঙ্গিস শুধু বলল:

'আবার দেখা হবে...'

ফিরে তাকাল না জাকির।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় জারাঙ্গিস অভিযোগ ভরা গলায় টেলিফোন করে তাকে বলল যে নক্সাগুলোর অনেক কিছু তার মাথায় ঢুকছে না।

'বেশ, কাল বুঝিয়ে দেব। আজ কোনো লাভ নেই, কাজ শেষ।' রিসিভার নামিয়ে রাখল জাকির।

জারাঙ্গিস ফোন করল অনতিবিলম্বে।

‘আর কিছুক্ষণ থেকে যাব কাজের জন্য। আপনি আজই বুঝিয়ে দিলে ভালো হয়।’

রাগে লাল হয়ে উঠল জাকির।

‘বেশ। অন্য সিফ্‌টের লোক এলেই আমি যাব।’

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় মেহ্‌রিবানের সঙ্গে দেখা করার কথা।

সিফ্‌ট বদল হবার সঙ্গে সঙ্গে জাকির গেল নক্‌সা-বিভাগে। দরজার হাতলে হাত রেখে নিমেষের জন্য দ্বিধা করল, “না গেলেই বোধ হয় ভালো? ওর কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকা উচিত...” কিন্তু নক্‌সাগুলো খুব জরুরী। তাছাড়া সে জানে, একবার সামলেছিল, অন্যবার সেটা হয়ত শক্তিতে কুলোবে না। দম নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।

জারাঙ্গিসের দৃষ্টিতে অভিমানের ছাপ। সে দৃষ্টিতে বিনীত ও লজ্জা লজ্জা একটা ভাবও আছে। জাকির স্বভাবসিদ্ধ কর্মব্যস্ততায় সটান টেবিলের কাছে গিয়ে বলল:

‘দেখি, কী আপনি বোঝেননি!’

‘এ পাইপটার ঢোকার আর বেরিয়ে যাবার মাপ খাপ খাচ্ছে না,’ নক্‌সাটা খুলতে খুলতে বলল জারাঙ্গিস।

দুজনে বোর্ডে কনুই রেখে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে মাপগুলো দেখতে লাগল। নক্‌সা বোর্ডটা বিশেষ বড়ো নয়, দুজনের কাঁধে কাঁধ লাগল। কাঁধ পর্যন্ত আনাবৃত জারাঙ্গিসের উষ্ণ হাত যেন আগুনের হলকা, জাকিরের বাকরোধ হয়ে গেল। জারাঙ্গিসের

মুখেও কোনো কথা নেই। কতক্ষণ এ ভাবে কাটল কে জানে। অবশেষে আত্মসম্বরণ করে জাকির বলল:

'সবই তো ঠিক আছে। এ রকমই তো হওয়া উচিত।'

তার দিকে না তাকিয়ে জারাঙ্গিস জিজ্ঞেস করল:

'এ রকমই কেন হবে? বুঝতে পারছি না।'

'বেরোবার মুখের দিকে পাইপটা সরু হওয়া দরকার চাপ বারাবার জন্য।'

জাকিরও ঠিক করেছে জারাঙ্গিসের দিকে তাকাবে না। কনুই'এর ওপরে হাতটা এখনো যেন জ্বলছে।

'আর কোনো প্রশ্ন নেই তো?'

'আছে...' আবার নক্‌সা বোর্ডে ঝুঁকে পড়ল জারাঙ্গিস। বোর্ডটা যেন আরো ছোট্ট হয়ে গিয়েছে। জাকিরের এত কাছে সে সরে এল যে তার চুল স্পর্শ করল জাকিরের মুখ আর গলা।

অসহ্য ব্যাপার! টেবিল থেকে পিছিয়ে এসে গভীর নিশ্বাস নিল জাকির, যেন দম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর ধরা গলায় নিচু স্বরে বলল:

'শুনুন, এটা কি একটা খেলা?'

জয়লাভ আসন্ন আঁচ করে জারাঙ্গিস হাসল উল্লাসের হাসি। জাকিরের শক্তি ফুরিয়ে গেছে, তবু পরাজয় সে মানল না:

'আপনি আমার কাছে কী চান?'

ভুরু কপালে তুলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল জারাঙ্গিস:

'আমি?.. আপনার কাছ থেকে?..' উচ্চকিত হাসিতে সে

যেন ফেটে পড়ল। 'না, আপনি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ!.. যান... শুনছেন?'

জাকির গেল না।

...এসময় সমুদ্রতীরে উইলোগাছের তলায় সেই বেঞ্চিটার কাছে মেহ্‌রিবান ঢেউ'এর রহস্যময় ফিসফিসানি শুনতে শুনতে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। প্রতীক্ষার শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত চলে গেল সে।

প্রথম প্রথম জাকির ভাবে যে জারাঙ্গিসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, যার সূত্রপাত বিনা অনুরাগে, কিছুদিনের মধ্যেই তার কাছে বিস্বাদ লাগবে, আপনা থেকে ভেঙে যাবে সে সম্পর্ক। তখনো মেহ্‌রিবানের প্রতি তার অনুরাগ সে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তাই দেখাসাক্ষাতে ছেদ টানেনি। কিন্তু আকাশপাতাল তফাৎ যে দুটি মেয়ের মধ্যে তাদের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা আর প্রেমের ভান করা অসহ্য হয়ে দাঁড়াল তার কাছে। তবু দুজনের কাউকেই সে ছাড়তে পারল না। মেহ্‌রিবান তাকে সঁপেছে নিজের জীবন, নিজের স্বপ্ন, নিজের প্রথম অনুরাগ। জাকির না পারে জারাঙ্গিসকে ছেড়ে দিতে — সে দৈহিক ভোগবিলাসের অঙ্গীকারে ক্রমাগত তাকে আরো শক্ত করে বাঁধছে, না পারে ত্যাগ করতে মেহ্‌রিরানকে, সে টানে তার অন্তরকে। দুজনের কাছে মিথ্যে কথা বলতে হয় তাকে, যত বলে ততই অসহ্য ঠেকে।

জারাঙ্গিস টের পেত যে জাকির সম্পূর্ণভাবে তার নয়।

তার ইচ্ছে যে জাকিরের মনও কেড়ে নেয়, সে জন্য সবকিছু সে করত। মেহ্‌রিবানের সঙ্গে ঘটনাচক্রে দেখা হবার পর সে আঁচ করে নিল যে তার ও জাকিরের মধ্যে কী একটা সম্পর্ক আছে। ছোট্টখাটো সাদাসিধে টেলিফোনের মেয়েটি কী করে জাকিরের মতো কারখানার একজন প্রধান কর্মী এবং সুপুরুষকে আকর্ষণ কয়তে পারে, সেটা তার বোধশক্তির বাইরে, তবু দুজনের সম্পর্কে সে বিচলিত। জাকিরের সঙ্গে দেখা হলেই সে সুকৌশলে মেহ্‌রিবানের উদ্দেশ্যে বিষবাণ নিক্ষেপ করত, ক্রমে ক্রমে জাকিরের মন বিষিয়ে উঠল। সাক্ষাতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সময়টি জারাঙ্গিস বেছে নিত, জাকির যখন তার একান্ত মুগ্ধ ও অনুগত দাস, আর নিজের অনুভূতি বাঁচাবার যতই চেষ্টা করুক না সে, জারাঙ্গিসের বিষবাণ লক্ষ্যভেদ করত, তার প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল: দুজনকে সে তুলনা করে দেখত, আর তুলনাটা মেহ্‌রিবানের পক্ষে সুবিধের নয়...

জারাঙ্গিসের একটি বান্ধবী সিনেমার টিকিটঘরে কাজ করে। সন্ধ্যেবেলায় কাজে যাবার আগে ঘরের চাবি সে দিয়ে যেত জারাঙ্গিসকে। ছোট্ট আরামি ঘরটা জাকির ও জারাঙ্গিসের মিলনস্থল হল। প্রতিবার স্থপতি বা প্রফেসর মানসুরভের সঙ্গে সাক্ষাতের ছুতোয় মেহ্‌রিবানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাকির তাড়াতাড়ি যেত সেখানে।

'আজ আবার দেরি হল কেন?' সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করত জারাঙ্গিস। একেবারে কাছে গিয়ে তার সার্ট, টাই বা

কলারে মুখ চেপে দেখত অন্য কোনো গন্ধ আছে কি না। প্রতিবার জাকির একটা না একটা সাফাই গাইত, মিথ্যে কথা বলার বিদ্যেটা ক্রমে ক্রমে সে নিখুঁত করে ফেলেছে। কিন্তু জারাঙ্গিসের অবিশ্বাস যেত না। একদিন হঠাৎ সে ঘরের আলো জ্বালিয়ে চোখে ক্রোধের ঝিলিক হেনে চেঁচিয়ে উঠল:

'হয় আমি নয় সে! বলো, তোমার জন্য ও কী ছেড়েছে, প্রেমের প্রমাণ কী দিয়েছে? তোমার জন্য কী করেছে ও! আমি তো তোমাকে সর্বস্ব দিয়েছি, আমার হৃদয়, রূপ, নিজেকে, সবকিছু সঁপেছি! তোমাকে যে ভালোবাসি তা প্রমাণ করেছি। ওর দিকে তাকাও, আর তাকাও আমার দিকে!'

ঠোঁট থরথর কাঁপছে, চোখ জলে ভরে গিয়েছে। গভীর নিশ্বাস ফেলে জারাঙ্গিস বসন ছিঁড়ে ফেলল। চোখে এল বেয়াড়া আহবানের ঝিলিক। তার অতর্কিত উন্মাদ ব্যবহারে জাকির হতবুদ্ধি, যেন তাকে কে গুলি করেছে। চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না সে, তারো মাথা যেন বিগড়ে গেল।

'হয় আমি নয় সে!'

জাকির বলল রুদ্ধশ্বাসে:

'তুমি!'

জারাঙ্গিস জিতেছে। এবারে জাকির সম্পূর্ণভাবে তার। জাকিরকে সে বলল মেহ্‌রিবানের সঙ্গে তার আলাপের কথা খুলে বলতে, দুজনের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে সমস্ত জানাতে। অনেক কষ্টে জাকির শেষ পর্যন্ত নিজেকে রাজী করাল। নিজের

প্রেমের ইতিহাস ধাপে ধাপে জারাঙ্গিসের সামনে খোলাতে তার অন্তর ছোট্ট হয়ে গেল, আর বলার পর চিরতরে বিচ্ছেদ ঘটল সে প্রেমের সঙ্গে, কেননা মেহ্‌রিবান ও তার প্রতি তার অনুভূতির সঙ্গে বেইমানি সে করেছে। জাকির খুঁটিয়ে বলল সব কথা, এমন কি তাদের সেই বেঞ্চিটার কথাও। জারাঙ্গিসের উল্লাস বাঁধ মানে না, নিজের জয়লাভে একেবারে মাতাল হয়ে যাবার জন্য বলল যেন পরের দিন জাকির তার সঙ্গে দেখা করে সেই বেঞ্চিটাতেই।

'এ কী অদ্ভুত কথা, এতে তোমার কী হবে!' ভুরু কুঁচকে বলল জাকির।

'না, আমি চাই সবকিছু আমার হোক, বেঞ্চিটাও আমার। ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করার মানে ওর সঙ্গে আর দেখা করবে না!'

'এ কী খামখেয়ালিপনা বোকার মতো!'

'তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো...'

ভুরু বেঁকিয়ে চুপ করে রইল জাকির। জারাঙ্গিস ছাড়ল না:

'কাল, কাল সন্ধ্যেবেলা... লোকজনের সামনে আমার সঙ্গে দেখা করতে ভয় পাও না তো?'

'আমি কাউকে ডরাই না। বেশ, কাল আসব।'

'ঠিক কিন্তু, কাল সন্ধ্যেবেলা...'

১৩

মেহ্‌রিবান মন দিয়ে কারখানার ব্যবস্থা দেখে শুনে নিল। এখনি লোকে তাকে টেলিফোনের সেরা মেয়েদের একজন ভাবে। ছোট্ট এক্‌স্‌চেঞ্জের দেয়ালগুলো যেন সরে গিয়ে খুলে ধরেছে কারখানার বিরাট এলাকার সবটা। এখন কারখানার প্রত্যেকটা অলিগলি মেহ্‌রিবান কল্পনা করতে পারে। অনেকের সঙ্গে তার আলাপ হল, তাদের ভালো লাগে বাড়ির লোকের মতো। কিন্তু সে ভাবেনি যে কারখানার বাইরেও তাকে কেউ চেনে।

একদিন সে কাজ করছে...

'তিন নং? কে, মেহ্‌রিবান?'

'আমিই মেহ্‌রিবান।'

'নমস্কার, বাছা! আমি জাকিরের মা...'

মেহ্‌রিবানের বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল, লাল হয়ে উঠল গাল, হতচকিত লাগল তার।

'নমস্কার, সুরিয়া-খানুম!'

আবার ভরাট নিচু গলা শোনা গেল:

'আমাদের তো মুখে মুখে আলাপ আছে...'

'হ্যাঁ, সুরিয়া-খানুম...'

'মেহ্‌রিবান! আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের এখানে এসো!'

'কিন্তু... কেন বলুন তো?'

'কিছু না, বাছা। শুধু আমি আর জাকিরের বাপ সন্ধ্যেবেলায় তোমাকে নেমন্তন্ন করছি।'

'তবু... আমি কিছু বুঝতে পারছি না...'

'অসাধারণ কিছু নয়, বাছা, শুধু একসঙ্গে বসে খাব, গল্পগুজব করব, হাসিইয়ার্কি চলবে। ব্যস, আর কিছু না। তোমার অপেক্ষায় থাকব কিন্তু। আমাদের বাসা চেন তো?'

'জানি... কিন্তু... আমাকে মাপ করবেন, আজ যেতে পারব না... আমার ক্লাস আছে সন্ধ্যেবেলায়...'

'না, তুমি দেখছি গোপন কথাটা বলিয়ে ছাড়বে... ব্যাপারটা হল এই যে আজ আমাদের বিয়ের তারিখ, তিরিশ বছর পুরো হয়েছে। এবার তো আর না বলবে না?' তেমনি সহজ আন্তরিকভাবে কিন্তু জোর দিয়ে সুরিয়া-খানুম যোগ করল, 'তাছাড়া, শেষ পর্যন্ত তো তোমাকে আমার চোখে দেখা চাই, তাই না? আমরা তাহলে তোমার অপেক্ষা করব!'

'আচ্ছা, ধন্যবাদ...'

সিফ্‌ট শেষ হলে স্কুলে ছুটল মেহ্‌রিবান। দুটো ক্লাস করে বাকিটা এই প্রথম সে বাদ দিল, ফাঁকিবাজ মেয়ের মতো। ফুলের দোকানে গিয়ে ছোট্ট একটা গোছা কিনে তাড়াতাড়ি বাড়ি গেল।

মেহ্‌রিবানের এমন হিসেব করে চলার অভ্যেস যে প্রতি মাসে তার কিছু টাকা জমত। যথেষ্ট টাকা জমার পর কাপড় কিনে একটা পোষাক সে সেলাই করে নেয়। মেহ্‌রিবান বাপের

সঙ্গে যখন রিগায় ছিল তখন প্রতিবেশিনী সেলাই করতে তাকে শেখায়। কাপড়টা দামী নয়, তবু ফিকে-নীল পোষাকটা তাকে বেশ মানায়। ওটা শেষ হয়েছে গতকাল, তখন থেকে ভাবছে ওটা পরে জাকিরের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। অবশ্য দুদিন জাকিরের কোনো পাত্তা নেই, কিন্তু মেহ্‌রিবানের বিশ্বাস সে নির্মাণস্থলে অত্যন্ত ব্যস্ত। ওখানে পুরোনো যন্ত্রাগারটা ভাঙা চলেছে। কখন জাকির ফুরসৎ পাবে তার আশায় সে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি পোষাক বদলে আয়নার কাছে গিয়ে মেহ্‌রিবান বিনুনি বাঁধল। অস্বাভাবিক একটা উত্তেজনা তার অন্তরে। বুলগেইজ-খালার সেই কথাটা মনে পড়ল, জাকিরকে জিজ্ঞেস করেছিল সে, "ও তোমার হবু-বউ?" "ওঁরা যখন বাড়িতে আমাকে ডাকছে, তার মানে..." চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

"আমি তাহলে সুখী হব? হবই বা না কেন? আমার কি সুখী হবার অধিকার নেই? কিন্তু জাকির নিজে কেন নেমন্তন্ন করেনি? হয়ত ও জানে না যে আমি আসছি? না, তা হতে পারে না! হয়ত সবাই মিলে এটা ঠিক করেছে। অন্য লোকেও ওখানে থাকবে বোধ করি। আমার সঙ্গে কী ভাবে আলাপ করিয়ে দেবে? হয়ত বলবে: 'জাকিরের বাগ্‌দত্তার সঙ্গে আলাপ করুন!' না, এভাবে লোকে বলে না, বরং বলে, 'আলাপ করিয়ে দিই, এ হল মেহ্‌রিবান। আমাদের জাকিরের সঙ্গে

কাজ করে কারখানায়...' এতে সবাই হয়ত মুচকি হাসবে... ব্যস।"

ভাবতে ভাবতে মেহ্‌রিবান হাসল, মনে হল শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আয়নায় আর একবার পোষাক আর খোঁপা দেখে পছন্দ হল। ফুলের গোছা সাবধানে ধরে বেরিয়ে এল।

অন্ধকারে ল্যাম্পপোস্টের দুধ রঙা আলোগুলোকে প্রকাণ্ড অদ্ভুত ফুলের মতো দেখাচ্ছে। কোথায় যেন নিওন আলোয় ফুটে উঠেছে ছাদের কার্ণিশ, উজ্জ্বল দেখাচ্ছে নানা রঙা বিজ্ঞাপন। সন্ধ্যার বাকু চমৎকার সেজেছে।

সাবির পার্কের সামনে দিয়ে মেহ্‌রিবান চলল, পুরোনো কেল্লাটির খাঁজ কাটা দেয়ালের কাছে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে আগ্রহ ভরে দেখল ফোয়ারাটি। রাস্তার আলোয় কী ভাবে অবিরত কখনো লাল কখনো সবুজ, কখনো বা হলুদ হয়ে উঠছে ফোয়ারা; কার্ল মার্কস বাগান হয়ে গিয়ে পড়ল নবীন গাছের সারি ভরা পথে, সেখানে সুসজ্জিত লোকের ভিড়। কে যেন তাকে ডাকাতে মুখ ঘুরিয়ে মেহ্‌রিবান দেখল সহকর্মিনী নাজিলা গুসেইনভা।

'কোথায় যাচ্ছ?' নাজিলা জানতে চাইল।

'এই এমনি... দূর সম্পর্কের একটি আত্মীয়ের বাড়িতে জন্মদিন আজ। আর তুমি? একলা না কি?'

নাজিলা বিব্রত হয়ে উঠেছে। মনে হল মেহ্‌রিবানকে ডাকার জন্য আফসোস তার।

'আমি? এই...' কোনো রকমে বিড়বিড় করে সে বলল, ইচ্ছেটা পাশ কাটিয়ে চলে যাবার কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পুরুষের গলায় তাকে কে ডাকল, 'নাজা!'

উত্তরে ঘুরে দেখল না নাজিলা, কিন্তু মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

পথ করে দুজনের কাছে এল একটি মাঝারি লম্বা যুবক, হাতে দুটো আইসক্রীম। কাছে আসাতে নাজিলা অপ্রস্তুত হয়ে নিচু গলায় বলল:

'না, আমি... আর ও। আমি একলা নই। আলাপ করিয়ে দিই — এ হল ফাখ্‌রিদ্দিন।'

মেহ্‌রিবান হাত বাড়িয়ে দিল। কারখানা থেকে বেরোবার পথে যুবকটিকে কয়েকবার সে দেখেছে। নাজিলার চেয়ে বেঁটে, কিন্তু বেশ পাকাপোক্ত ভাব।

'ফাখ্‌রি, এই হল মেহ্‌রিবান। এর কথা তোমাকে বলেছি।'

ভারি গলায় মন্তব্য করল ফাখ্‌রিদ্দিন:

'এ-রকম তো হয় প্রায়ই: ভালো লোকের কথা অনেক শুনি, কিন্তু চেনাশোনা হয় না। আপনার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত খুশি হলাম বোন।'

মেহ্‌রিবানকে একটা আইসক্রীম সে এগিয়ে দিল, আর অন্যটা নাজিলাকে। মেহ্‌রিবান আপত্তি করল।

'ধন্যবাদ, আমার চাই না...'

'না বোন, না নিলে আমি চটব।'

আইসক্রীম নিয়ে আবার ধন্যবাদ জানাল মেহ্‌রিবান।

'শোনো, নাজা,' কাজের লোকের মতো বলল ফাখ্‌রিদ্দিন, 'আমাদের বিয়েতে বোনটিকে নেমন্তন্ন করতে ভুলো না কিন্তু।'

টকটকে লাল হয়ে উঠল নাজিলা। হুঁ, ভাই বটে! কথাটা এমন জোর গলায় এক্ষুণি না বললে যেন চলত না! নাজিলা অপরাধীর মতো তাকাল মেহ্‌রিবানের দিকে, মেহ্‌রিবান হাসল, সে বুঝেছে সব, যেন বলতে চায়: "অনেক দিনই জানতাম!"

'আচ্ছা, সুখী হন আপনারা!' তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে গেল মেহ্‌রিবান। জাকিরের বাড়ি যেতে হবে তো শীগগির।

যেতে যেতে তাড়াতাড়ি আইসক্রীমটা খেল সে, পোষাকে যেন না পড়ে, হাতদুটো যেন চটচটে না হয় সেদিকে নজর রেখে।

পাঁচতলা নতুন বাড়িতে থাকে জালালভেরা। সেখানে পেঁাছিয়ে মেহ্‌রিবান থামল, সযত্নে হাত আর ঠোঁট পুঁছে সিঁড়ি বেয়ে উঠল। তিনতলায় উঠে দম নিল, "ক. ম. জালালভ" লেখা ব্রোঞ্জের ঝকঝকে নাম-ফলকটা দেখে উত্তেজনায় ভরে গেল সমস্ত দেহ। মনে হল ফিরে যাবে, কিন্তু আসার কথা যে দিয়েছে। গভীর একটা নিশ্বাস নিয়ে দৃঢ়ভাবে দরজায় গিয়ে কম্পিত হাতে মেহ্‌রিবান ঘণ্টা টিপল। ভেতরে স্ত্রীপুরুষের উচ্চকিত কণ্ঠস্বর আর হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কে যেন বেশ চেঁচিয়ে মিঠে গলায় "শাহ ইসমাইল" অপেরা থেকে

আস্‌লানশাহের আরিয়া গাইছে। দরজার ওধারে ধ্বনিত হল কাছে-আসা পায়ের শব্দ, চাবির খুট করে আওয়াজ, দরজা খুলে গেল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘাঙ্গিনী একটি সুন্দরী মহিলা, চেহারায় মর্যাদার ছাপ। মেহ্‌রিবানকে দেখে তার মুখে ক্ষীণ বিব্রত একটা ছায়া ফুটে উঠল। নিমেষের জন্য অবশ্য। আর মেহ্‌রিবানের একটা অদম্য ইচ্ছে হল যে চলে যায়, ছুটে পালিয়ে যায়, কিন্তু নরম স্নিগ্ধ গলায় তাকে মহিলাটি বলল:

'ভেতরে এস, বাছা, ভেতরে এস! তুমিই... মেহ্‌রিবান, ভুল করিনি তো?' গলাটা মেহ্‌রিবানের চেনা মনে হল।

'নমস্কার, সুরিয়া-খানুম!'

'নমস্কার! বাছা, তোমাকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভেতরে এস!'

মেহ্‌রিবানের কাঁধ জড়িয়ে সুরিয়া-খানুম ভেতরে নিয়ে গেল। জামাকাপড় রাখার স্ট্যাণ্ডের কাছে ছোট্ট টেবিলে ফুলের গোছাটা রাখল মেহ্‌রিবান। সুরিয়া-খানুমের দিকে সে তাকিয়েই রইল। বিশ্বাস করা যায় না যে এই ভরন্ত মহিলাটির তিরিশ বছর বিয়ে হয়েছে। পাতলা, স্বল্প ভুরু, পাখির ডানার মতো। গায়ের রঙ ঝরঝরে, গোলাপি; স্নিগ্ধ বাদামি চোখে নরম শান্ত দৃষ্টি। ঘন বাদামি চুলে পাক ধরেনি একেবারে, বেড়া বিনুনি করা। বাঁ কানের উপরে চুলে ছোট্ট একটি গোলাপ গোঁজা। দেখার সঙ্গে সঙ্গে সুরিয়া-খানুমের প্রতি আসক্তি হল

মেহ্‌রিবানের, ইচ্ছে হল সর্বক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে। চেহারায় শুধু একটা খুঁত, সুরিয়া-খানুম মোটা হতে শুরু করেছে।

সুরিয়া-খানুমকে এত ভালো লাগল মেহ্‌রিবানের যে বিমর্ষভাবে সে ভাবল: 'আমার যদি এরকম মা হত!'

আর মেহ্‌রিবানকে দেখে অল্প হতাশ হল সুরিয়া-খানুম। প্রথমত, জাকিরের চেহারা অনেক ভালো। দ্বিতীয়ত, মেয়েটির বাড় এত কম যে এখনো বাচ্চা মনে হয়। মুখটা অবশ্য অসুন্দর বলা চলে না, কিন্তু সুরিয়া-খানুমের চোখে তাতে অসাধারণ কিছু নেই। নিজের হতাশাটা যাতে ধরা না পড়ে সেজন্য সুরিয়া-খানুম দ্বিগুণ আদর দেখাতে লাগল।

'সত্যি, তুমি বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে, ঠিক এসেছ কিন্তু। চল, চল,' মেহ্‌রিবানকে জড়িয়ে সুরিয়া-খানুম সবচেয়ে প্রিয় অতিথির মতো ঘরে নিয়ে গেল, 'আলাপ করিয়ে দিই, এ হল মেহ্‌রিবান!' অল্প ভারিক্কিভাবে ঘোষণা করল সে।

বারান্দায় দরজার কাছে ছোট্ট একটি টেবিলে অন্য একজনের সঙ্গে দাবা খেলছিল মাথাজোড়া টাক একটি ভদ্রলোক। চশমা কপালে তুলে মেহ্‌রিবানকে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল:

'এটা, এটা কী ওর নাম, না ও সত্যি "মেহ্‌রিবান"*?'

স্ফটিক আর রুপোর বাসনপত্রে সুষ্ঠুভাবে সাজানো

* আজেরবাইজানীয় ভাষায় "মেহ্‌রিবান" মানে "পেয়ারী"।

টেবিলের এক পাশে বসা অতিথিরা সবাই হেসে উঠল। সুরিয়া-খানুমও হেসে ফেলল।

'হ্যাঁ, আমারো মনে হয় নামটা ওকে খাসা মানিয়েছে!' মেহ্‌রিবানের আরক্তিম মুখের দিকে তাকিয়ে আদর করে বলল সুরিয়া-খানুম। 'এস, বাছা, আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

প্রথমে কার কাছে এগবে ঠিক করতে পারল না মেহ্‌রিবান। তাড়াতাড়ি ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে টেবিলের কাছে এসে মেহ্‌রিবান প্রথমে দাবার ছকের সামনে টাক মাথা মোটাসোটা ভদ্রলোকটির দিকে ছোট্ট হাতটা বাড়িয়ে দিল।

টেকো লোকটি আবার চশমা কপালে তুলে অদূরে-বসা স্ত্রীর দিকে এমন অসহায়ভাবে তাকাল যেন নিজের নাম ভুলে গিয়েছে, তারপর কপাল চাপড়ে বলল:

'হুঁ... মিরালিয়েভ, গুলাম! বল তো মেয়ে, নামটা তোমার পছন্দ?'

মেহ্‌রিবান হেসে ফেলল।

'মানুষটিকেও আমার পছন্দ,' বলে সে তার সঙ্গীর দিকে ঘুরল। মুখ থেকে নিভে-যাওয়া পাইপটা সরিয়ে সে ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়িয়ে মনোযোগসহকারে, বলতে গেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেহ্‌রিবানের দিকে তাকিয়ে তার করমর্দন করল। মেহ্‌রিবানের বুক ধকধক করে উঠল, মনে হল তার হাত পড়ে আছে জাকিরের চওড়া হাতে। বাপ ছেলের চেয়ে বেঁটে, কিন্তু

মুক্ত দৃষ্টি, মন-ভোলানো হাসি আর পরিষ্কার বলিষ্ঠ চিবুক— সবকিছু জাকিরের মতো।

'কামিল...'

জাকির ক্লান্ত হয়ে পড়লে তারও গলায় এমনি একটা ধরা-ধরা ভাব আসে। এ মানুষটির মধ্যে অনুভব করা যায় সততা, স্থিরতা ও সংযম। বেশ জোরে হাতে চাপ দিল সে। অস্ফুট কণ্ঠে মেহ্‌রিবান নিজের নাম বলল।

পিয়ানোর কাছে দাঁড়িয়ে যে গান গাইছিল সে হল প্রফেসর মানসুরভ। মেহ্‌রিবানের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে সে বন্ধুর মতো হেসে বলল:

'আমরা তো পুরোনো আলাপী, কী বল খুকী?'

মানসুরভের ছেলে, বছর ষোলো বয়স হবে, বেশ একটা কায়দায় বাঁ হাতে মাথার চুল সরিয়ে ঘোষণা করল:

'ওস্‌মান,' তারপর মোটাসোটা সদাশয় চেহারার স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়ে বলল, 'আমার মার সঙ্গে আলাপ করুন।'

'সালতানাত,' কেমন যেন একটু সংকুচিত হয়ে মহিলাটি তার নাম বলে উঠল, আর বাকু শহরের অতি নম্র বাসিন্দাদের মতো একসঙ্গে চারটি আঙুল চেপে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'এবার আমার নিগ্রহকারিনীর সঙ্গে পরিচয় করুন,' দাবা না ছেড়ে ঘোষণা করল মিরালিয়েভ। 'এঁর জন্য আমার মাথায় একগাছা চুল পর্যন্ত টেকেনি। এঁর নাম জটাবুড়ী!'

'জটাবুড়ী তো তোমার ঠাকুমা'র নাম,' সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা

জবাব দিল হাসিখুসি রসিকা স্ত্রীলোকটি। 'আর টাক নিয়েই তোমার জন্ম, আমার কী দোষ শুনি?'

আবার সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মিরালিয়েভের স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল মেহ্‌রিবানের। তার নাম মেলিএক।

সবায়ের দিকে চেয়ে মেহ্‌রিবানের চোখ আপনা থেকে গেল দরজার দিকে। অস্থির অপেক্ষায় সে রয়েছে, পাশের কোনো একটা ঘর থেকে হয়ত এখুনি আসবে জাকির। এসে নমস্কার জানিয়ে তার হাত ধরবে। কোণের একটা নরম সোফায় বসে মেহ্‌রিবান সঙ্গীত আর কথাবার্তা শুনতে লাগল। চমৎকার বাজায় ওস্‌মান। বাপ-মা ছেলের দিকে সগর্বে তাকিয়ে আছে। এখানকার সবকিছু ভালো লাগছে মেহ্‌রিবানের। শুধু একটা জিনিসে তার অস্থিরতা — জাকির এখনো এল না কেন?

সুরিয়া-খানুম দোলমার বেশ বড়ো একটা প্লেট নিয়ে এসে না থেমেই পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলল:

'যথেষ্ট হয়েছে, এবার ক্লাব বন্ধ করুন তো। খাবার সময় হয়েছে।'

'শেষ করব?' জিজ্ঞেস করল কামিল।

'হার মানো, শেষ করা যাক,' বলল মিরালিয়েভ।

'ড্র হয়েছে,' শান্ত গলায় ঘোষণা করল কামিল।

'তাই নাকি?' প্রতিবাদ করে উঠল মিরালিয়েভ, ঝগড়ায় তার বেশ উৎসাহ। কোনো কথা না বলে কামিল তার ও নিজের

কয়েকটা গুটি সরিয়ে দেখাল যে মিথ্যে বলেনি। নিশ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়াল মিরালিয়েভ।

'বেশ! কিন্তু আমাদের "পেয়ারী" এক কোণে লুকিয়ে রয়েছেন কেন?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল মিরালিয়েভ।

'এখানে বেশ আছি,' সলজ্জভাবে বলল মেহ্‌রিবান।

আগেকার মতো মনোযোগসহকারে তাকে দেখল কামিল।

'আজকে মেহ্‌রিবান-খানুম আমার পাশে বসবেন,' দৃঢ় গলায় জানাল মিরালিয়েভ। মানসুরভ মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল।

'তোমার পাশেই কেন? আমি পুরনো আলাপী, তোমার খাতিরে আমাকে ত্যাগ করবে কেন?'

'আপনারা মিছিমিছি ঝগড়া করছেন। মেহ্‌রিবান বসবে আমার কাছে,' মেহ্‌রিবানকে জড়িয়ে ধরল সুরিয়া-খানুম। ঝগড়া বেড়ে গেল। দুহাত তুলে মানসুরভ সবাইকে চুপ করাল।

'তবে বিচার করা যাক যুক্তিসঙ্গতভাবে। আমাদের বেশির ভাগ এসেছে জোড়ায় জোড়ায়, কিন্তু এমনো লোক আছে যার জোড়া নেই। এই ধরুন, ওস্‌মান — ও কি মেয়েদের সঙ্গী হতে পারে না? আজকাল বাদেই নিজস্ব পাসপোর্ট পাবে ও! আমার মতে, মেহ্‌রিবানের উচিত ওর পাশে বসা!'

এভাবে মীমাংসা হল সমস্যাটির। ওস্‌মান বাঁ হাতে চুল সরিয়ে ঠোঁট চেপে নিজের চেয়ারটা মেহ্‌রিবানকে এগিয়ে দিল। এই মেয়েটির কাছে নিজেকে বড়োসড়ো প্রমাণ করায়

তার অত্যন্ত আগ্রহ, নিজেকে কোনোপ্রকারে সে জাহির করতে চায়। টেবিলে সবাই বসতে না বসতে সে পিয়ানোর কাছে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে কয়েকটা সুর বাজায়, নয় পিয়ানোর চাবিতে গোটা কয়েক অংশ তোলে, একবার পাকা লোকের মতো মুখ করে চীনে জিনিসগুলো দেখে, আবার রেডিওর কাছে গিয়ে রেডিও বাজায়, মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকায় মেহ্‌রিবানের দিকে। তার ফিকিরগুলো স্পষ্ট ধরা পড়েছে মেহ্‌রিবানের কাছে, অনেক কষ্টে সে হাসি চেপে রইল, মুখে একটা সিরিয়াস ভাব আনার চেষ্টা তার। পাশাপাশি বসল দুজনে। আর সবাই বসল, ছুরি কাঁটার শব্দ, গেলাস আর প্লেটের ঠুনঠুন। মেয়েদের ঘুঘু সাথীর মতো মেহ্‌রিবানের দেখাশোনা করছে ওস্‌মান, প্রতি মিনিটে জিজ্ঞেস করছে তাকে কী দেবে। সবকিছু খেতে ভালো, কিন্তু মেহ্‌রিবান খেল কম, লজ্জা করে নয়, বেশি খাওয়া তার অভ্যেস নেই বলে।

মানসুরভ দাঁড়িয়ে পানপাত্র তুলল। দুজন মানুষের কথা সে বলল, যে দুজনের আলাপ হয় ছাত্রাবস্থায়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়, তারপর আরো বলিষ্ঠ উষ্ণ একটা অনুভূতির কাছে আত্মসমর্পণ করে বিয়ে করে তারা। তখনো ছোট্ট ভাড়া ফ্ল্যাটে ছাত্রসুলভ জীবনযাত্রা তাদের। ক্রমে ক্রমে জীবনে একটা পথ করে নিল দুজনে, অনেক খাটে, বুদ্ধিমন্ত প্রতিভাবান ছেলেকে মানুষ করে। এখন পর্যন্ত দুজনে নবীন রয়েছে, সেই প্রথম

অনুরাগের উষ্ণতা টিকিয়ে রেখেছে, এখনো দুজন দুজনকে ডাকে "জান" বলে...

'দুজন বন্ধুর জন্য, দুজন বিজ্ঞানীর জন্য, সুরিয়া-খানুম আর কামিলের জন্য!' উচ্চকণ্ঠে বলল মানসুরভ।

সবাই হৈহৈ করে দুজনকে অভিনন্দন জানাল, গেলাসের ঠুনঠুন, ফূর্তির হাসি আর কথাবার্তার বিরাম নেই। মেহ্‌রিবান বিব্রত, নিজের গেলাস নিয়ে কী করবে সে জানে না। জীবনে কখনো মদ খায়নি। তার অসহায়ভাব মিরালিয়েভের চোখে পড়ল।

'না না, এরকম চলবে না!' চেঁচিয়ে বলে টেবিল থেকে সুরাপাত্র তুলে এগিয়ে দিল তাকে।

'না, আমি পারব না, আমি মদ খেতে পারি না!' গেলাসটা সরিয়ে দিল মেহ্‌রিবান।

'ওকে জোর করবেন না, যদি খেতে না চায় খাবে না!' বলল সুরিয়া-খানুম। কিন্তু মিরালিয়েভ গোঁ ধরে বলল:

'আমি তো বলছি না যে সবটা খেতে হবে। আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ঠোঁটে একটু লাগাক!'

'বাচ্চাদের মদ খেতে শেখানো দরকার নেই!' ধমক দিল মেলিএক। 'তুমি ভাব সবাই তোমার মতো — তুমি তো মদ পেলেই খুশি!'

"বাচ্চা" কথাটা কিছু না ভেবে বলেছে মেলিএক, কিন্তু শুনে আত্মসম্মানে ঘা লাগল মেহ্‌রিবানের। গেলাসটার পাতলা

হাতল দৃঢ়ভাবে ধরে সমস্ত শক্তিসঞ্চয় করে এক ঢোক খেল সে। সস্নেহে তার দিকে মাথা নেড়ে সুরিয়া-খানুম বলল:

'ধন্যবাদ বাছা।'

মেহ্‌রিবানকে সমনোযোগে দেখতে লাগল কামিল। মেহ্‌রিবানের চোখের সামনে তখনি ঝকঝকে কয়েকটা বিন্দু নাচতে শুরু করেছে। দেখে মনে হল এক ঢোক খেলেই তার মাথা ঘোরে। নেশা ধরেনি বটে, কিন্তু সমস্ত শরীর অদ্ভুত হালকা লাগছে আর কিছুক্ষণ আগেকার আড়ষ্ট ভাবটা একেবারে কেটে গেছে।

'তুমি কিছু খাচ্ছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল সুরিয়া-খানুম।

হাসল মেহ্‌রিবান, এখন নিজেকে তার একেবারে স্বচ্ছন্দ লাগছে।

'বেশি খেতে পারি না, অভ্যেস নেই।'

'খাবার বোধ হয় ভালো লাগছে না?'

কথাটা কেমন করে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল মেহ্‌রিবান নিজেই বোঝেনি, কিন্তু টেবিলের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে সে হঠাৎ বলল:

'এত ভালো খাবার জীবনে কখনো খাইনি!'

'তাহলে আরো খাও!'

হেসে মেহ্‌রিবান বলল:

'ভয় করছে, সুরিয়া-খানুম। ভালো খাবার বেশি খেলে

কালকে আবার রোজকার সেই আলুপেঁয়াজ আর মুখে রুচবে না।'

কথাগুলো এত আন্তরিক আর সরল যে সবাই বুঝল মেহ্‌রিবান ঠাট্টা করে বলেনি। সুরিয়া-খানুমের বুকটা ভারি হয়ে উঠল, এ-রকম কথাটা যে তারি জন্য উঠেছে ভেবে অনুশোচনা হল। আর হঠাৎ সাধারণ চেহারার এই ছোটখাটো মেয়েটির মধ্যে সে দেখল একটি শুদ্ধ সৎ মানুষকে, যে মানুষ সাহস ভরে অভাব সহ্য করে। এবার মেহ্‌রিবানের বিষয়ে সবকিছু, তার হৃদয়ে কী আছে, সমস্ত জানার ইচ্ছে হল সুরিয়া-খানুমের। কিন্তু খাবারের কথা তুলে বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়নি বলে নিজের উপর সে বিরক্ত। কী করে অবস্থাটা কাটানো যায় বুঝতে পারল না সে। শেষ পর্যন্ত অস্বস্তিকর স্তব্ধতার মধ্যে শোনা গেল তার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর:

'কিছু মনে কোরো না বাছা, এ বিষয়ে কথা বলতে চাইনি। যদি শুনতে চাও তো বলি, আমরাও শুরু করি এভাবে।' এমনভাবে সে চাইল স্বামীর দিকে যেন তার সমর্থন চায়।

এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনছিল কামিল। এবার পাইপ ধরিয়ে অন্য কথা তুলল:

'জাকির কোথায় আটকা পড়ল?' এই প্রথম মেহ্‌রিবানকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, 'আমরা ভেবেছিলাম যে তোমরা একসঙ্গে কারখানা থেকে আসবে।'

সুরিয়া-খানুম অতিথিদের কাছে তার কী পরিচয় দিয়েছে

সেটা এখনি শুধু মনে পড়ল মেহ্‌রিবানের। জাকিরের নাম সে করেনি, বলেনি যে তারা দুজন একসঙ্গে কাজ করে একই কারখানায়। কামিলের প্রশ্নে এবার অনিশ্চয়তা কেটে গেল একমুহূর্তে, দুজনের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করে সে জানিয়ে দিল যে ওরা দুজনে বন্ধু। একটা প্রয়াস করে মেহ্‌রিবান বলল:

'আমি যখন কারখানা থেকে বেরোই ও সেখানে ছিল না।'

...আবার পান ও আহার চলল, কথাবার্তা, হাসি। মানসুরভের দ্বিতীয় টোস্ট সবচেয়ে ভালো লাগল মেহ্‌রিবানের। টোস্টটা জাকিরের নামে।

'হ্যাঁ, জাকির বাস্তবিক নিজের কাজ ভালোবাসে। ও প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়র আর পাকাপোক্ত ব্যবস্থাপক। এক বছর ওর কর্মদক্ষতা আমি ভালো করে দেখেছি, ওর সঙ্গে কাজ করি তো। আমার উদ্ভাবন নিয়ে আমার চেয়ে ও বেশি মাথা ঘামায়, এটা উল্লেখযোগ্য। নাছোড়বান্দা লোক, একগুঁয়ে বটে। এ দুবছর আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে। ফুরসৎ দেবে না, খালি তাড়া দেয়: "এটা করা যাক তাহলে, প্রফেসর!" হামেশা বলে: "প্রফেসর, লুব্রিকেটিং তেলের আপনার সেই উপাদানটা আমাদের কারখানায় তৈরি করতেই হবে, তৈরি করতে হবে আমারি ডিপার্টে। চার নং ডিপার্টটি যেন কারখানার মর্মস্থান হয়ে দাঁড়ায়। নতুন উৎপাদনটা আমার হাতে না থাকলে বুক ভেঙে যাবে, সত্যি বলছি!" বলা দরকার, যে উপাদানটার

আইডিয়া ওই আমাকে দেয়। ছোকরার মাথা পরিষ্কার আর মন শক্ত। জাকিরের জন্য!'

প্রথম সেই ঢোকটির পর মেহ্‌রিবান আর মদ খেল না। ওস্‌মান তাকে কী যেন বলে চলেছে তার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের বিষয়ে, নানা জলসা ও স্বনামধন্য লোকের কথা বলছে, কিন্তু মেহ্‌রিবানের মাথায় শুধু জাকিরের চিন্তা। কোথায় সে? আবার স্থপতির সঙ্গে কাজ করছে না কি? এখ্‌খুনি এসে পড়বে হয়ত, এখ্‌খুনি!

টেবিল থেকে সবাই উঠে পড়লে ওস্‌মান আবার পিয়ানোয় গিয়ে বসল। পুরুষেরা চীন ও ভারতের সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা চালাল, আর মেয়েরা স্বামীদের বিদঘুটে সব অভ্যেস, বাচ্চাদের কীর্তি আর সংসারের কাজের কথা নিয়ে। টেবিল থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে বড়ো রান্নাঘরে নিয়ে যেতে সুরিয়া-খানুমকে সাগ্রহে সাহায্য করল মেহ্‌রিবান। দেয়ালটা শাদা টালির। মেয়েটির সহজ খোলাখুলি ভাব আরো বেশি করে আকৃষ্ট করল সুরিয়া-খানুমকে।

রান্নাঘরে চায়ের পাট ঠিক করল সুরিয়া-খানুম। কিছু জিজ্ঞেস না করেই মেহ্‌রিবান বাসনপত্র ধুচ্ছিল, তার দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, কাল সন্ধ্যেবেলা জাকির তোমাকে বলেনি যে আজ আমাদের এখানে উৎসব?'

প্লেট ধোওয়া নিমেষের জন্য বন্ধ করে মেহ্‌রিবান বলল:

'আমি... এ কদিন জাকিরকে দেখিনি...'

'ঝগড়া হয়েছে নাকি?'

'না। ও ভয়ানক ব্যস্ত। দিনের বেলায় নির্মাণস্থানে আর ডিপার্টে, সন্ধ্যেবেলায় স্থপতি বা প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করে...'

সুরিয়া-খানুমের মনে হল, জাকিরের সঙ্গে ঘন ঘন সাক্ষাতের কথাটা চেপে যেতে চায় মেহ্‌রিবান।

'কাল আমরা মানসুরভের ওখানে গিয়েছিলাম, জাকির সেখানে ছিল না।'

হাতে প্লেট নিয়ে পাথর হয়ে গেল মেহ্‌রিবান। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল:

'হয়ত স্থপতির সঙ্গে কাজ ছিল...'

হেসে সুরিয়া-খানুম তর্জনী তুলে শাসাল তাকে:

'মিছিমিছি আমার কাছে লজ্জা পাচ্ছ, বাছা! আমি সরল সাদাসিধে মানুষ, আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা চলে সব বিষয়ে।'

'আপনাকে আমি সত্যি বলছি...'

'সবটা নয়। কিছু একটা লুকোচ্ছ আমার কাছ থেকে। স্থপতি তো দিন তিনেক আগে বাতুমিতে গিয়েছে প্লেনে, কাল ফিরবে।'

ভিজে প্লেটটা মেহ্‌রিবানের হঠাৎ নিঃসাড় আঙুল থেকে খসে পড়ল, কিন্তু সেটাকে ধরে ফেলে তোয়ালে দিয়ে জোরে জোরে সে ঘষতে শুরু করল।

'হয়ত এখন নির্মাণস্থানে আছে। সন্ধ্যেবেলায় প্রায়ই সেখানে যায়।'

মাথা নেড়ে সুরিয়া-খানুম বলল:

'কিছুক্ষণ আগে কারখানায় ফোন করেছিলাম। ও সেখানে নেই।'

স্থির হবার চেষ্টা করল মেহ্‌রিবান... এমন কি মুখে একটা হাসি পর্যন্ত টেনে আনল।

'তাই যদি হয়, সুরিয়া-খানুম, তাহলে আপনার ছেলে কোথায় সেটা আমার চেয়ে আপনার অনেক ভালো করে জানা উচিত।'

'ওর সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত জানতাম,' কী একটা ভাবতে ভাবতে জবাব দিল সুরিয়া-খানুম, 'কিন্তু পরে... ও বড়ো হল, স্বাবলম্বী হল... রাত্রে তোমার সঙ্গে কতক্ষণ ধরে টেলিফোনে কথা বলে সেটা নিজের কানে না শুনলে তোমাদের বন্ধুত্বের কথা টের পেতাম না... তোমার সঙ্গে মা-বাবা থাকেন?'

'আমার কেউ নেই, সুরিয়া-খানুম। আমি একলা... মা মারা গেছেন। বাবা আবার বিয়ে করেছেন, রিগায় থাকেন। ওদের বাচ্চাকাচ্চা হবার পর জায়গার টানাটানি হওয়াতে আমাকে এখানে পাঠিয়ে দেয়, ঠাকুমা'র কাছে। ঠাকুমাও মারা গেছেন। আমি একলা...'

এমন সহজ সাধারণভাবে সে বলল যেন তার একলা থাকাটায় দুঃসহ বা বিষণ্ণ কিছু নেই।

'তার মানে, এখন তুমি একেবারে একলা থাক?'

'হ্যাঁ...'

পরের প্রশ্নটি সুরিয়া-খানুম করল মৃদুকণ্ঠে, দ্বিধার সঙ্গে, যেন জিজ্ঞেস করতে তার লজ্জা:

'জাকির কি তোমার ওখানে প্রায়ই যায়?'

প্রশ্নটির মর্ম বুঝতে পেরে লাল হয়ে উঠল মেহ্‌রিবান।

'না... বাড়ির দরজা পর্যন্ত শুধু পৌঁছিয়ে দেয়।'

মেহ্‌রিবানের কাছে গিয়ে হঠাৎ তার মাথাটা বুকে চেপে সুরিয়া-খানুম চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

'কিছু মনে কোরো না, লক্ষ্মীটি! আমাকে মাপ করা চলে, আমি মা বটে তো? তুমি চমৎকার মেয়ে, সেটা বুঝেছি। খাঁটি সোনা। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি বাছা। জাকিরকে জোর করে ধরে রেখো। আমরা ওকে একটু বিগড়ে দিয়েছি। ওর মনটা অত্যন্ত অস্থির, সেটা সর্বদা ভালো নয়।' সোজা হয়ে দাঁড়াল সুরিয়া-খানুম। 'এবার যাওয়া যাক। ওরা অপেক্ষা করছে।'

ট্রেতে চায়ের গেলাস রেখে দুজনে বসার ঘরে গেল। অতিথিদের সামনে গেলাসগুলো রাখা হল। সুরিয়া-খানুম বলল:

'মেহ্‌রিবান লক্ষ্মীটি, আলমারি থেকে জ্যামের বাটিটা নিয়ে এস তো দেখি।'

মেহ্‌রিবান আলমারির কাছে গিয়ে তাক দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'কোথায়, এখানে?'

'না।'

'এখানে?'

'না, বাছা, মনে হচ্ছে নিচের তাকে...'

মেহ্‌রিবানের উপস্থিতিতে বাড়িটাতে একটা অনভ্যস্ত আরামের ভাব এসেছে, এখানে কিশোরী কণ্ঠ ধ্বনিত হয়নি কখনো। নিঃশব্দে সে আলমারি থেকে টেবিলে যাচ্ছে, টেবিল থেকে রান্নাঘরে, যেন ভেসে চলেছে, সবকিছুতে আলোর ছাপ ফেলে। প্রথমে যাকে সুরিয়া-খানুমের মনে হয়েছিল অতি সাধারণ, এখন তার সহজ সরল ভাবে সবাই মুগ্ধ। মেয়েটিকে যে জাকির ভালোবেসেছে তা আর অদ্ভুত ঠেকছে না সুরিয়া-খানুমের কাছে, সে বুঝল যে তার ছেলেও মেহ্‌রিবানের শুদ্ধতা আর সংযমের মাধুর্যের কাছে হার না মেনে পারেনি — সে মাধুর্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্ত হয় না, তার কদর সবাই করতে পারে না। তাছাড়া, এদের চেয়ে অনেক বেশি সে মেহ্‌রিবানকে চেনে বলে মাধুর্যের প্রভাবটা তার উপর আরো প্রখর।

একমাত্র সন্তান এমন একটি মেয়ের সঙ্গে নিজের ভাগ্য বেঁধেছে, তাতে কামিলও খুশি, সে নিঃশব্দে মেহ্‌রিবানকে

লক্ষ্য করে চলেছে। এতে প্রমাণ হয় যে জাকির বাইরের চাকচিক্যে মজার লোক নয়। স্ত্রীর মতো নয়, মেহ্‌রিবানকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় কামিল। কিন্তু প্রকাশ করেনি সেটা।

গৃহকর্ত্রী ও মেহ্‌রিবান যখন রান্নাঘরে তখন নবীনা অতিথিকে নিয়ে আলোচনা চলে। মেয়েদের একজন জানতে চায় মেহ্‌রিবান কে; মানসুরভ বলে যে মেয়েটি জাকিরের কারখানার টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জে কাজ করে, তার নতুন কর্মপদ্ধতি এরিমধ্যে অন্যান্য কারখানায় চালু হয়েছে। এ পরিবারে তার আবির্ভাবটা সকলেই ধরে নিয়েছে জাকিরের সঙ্গে যুক্ত। মেহ্‌রিবান ফেরাতে মেলিএক — ভদ্রমহিলা বড়ো মুখ পাতলা — হঠাৎ জিজ্ঞেস করল:

'বা, মেয়েটি তো এখানে, কিন্তু জাকির কই?'

অত্যন্ত অপ্রস্তুত লাগল মেহ্‌রিবানের।

'ও এসে পড়বে এখুনি,' শান্তকণ্ঠে বলল সুরিয়া-খানুম, 'ওর আজ জরুরী কাজ পড়েছে।'

টেবিলে ফল, জ্যাম আর মিষ্টি রাখছিল মেহ্‌রিবান। তার কাজের অনায়াস পাকা ধরনটা দেখে মেয়েরা ভুরুর ইশারায় আর মাথা নাড়িয়ে নিজেদের সন্তোষজ্ঞাপন করল। মেলিএক আবার বলে বসল:

'ভেবেছিলাম এ টক আঙুরের রস, এখন দেখছি মিষ্টি মধু! জাকিরের রুচিটা মন্দ নয় দেখছি!'

মেহ্‌রিবান প্রায় ছুটে পালাল রান্নাঘরে। হাসতে হাসতে সুরিয়া-খানুম সেখানে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে বলল:

'চল, ফিরে যাই চল!'

'না, সুরিয়া-খানুম, ওখানে আর যাব না!' তপ্ত গালে দুটি হাত রেখে দৃঢ়ভাবে বলল মেহ্‌রিবান। 'আপনি যান, আমি চায়ের পটটা দেখছি।'

'বোকার মতো কোরো না, লক্ষ্মীটি, চল!'

'না, সুরিয়া-খানুম, যেতে বলবেন না, লজ্জায় মরে যাব, আমি যাব না!'

'এই শুরু হল! মেলিএকের জিভের সামনে কেউ যেন না পড়ে! কিন্তু আমি কী করি বল তো? তাহলে তোমার সঙ্গেই এখানে থাকি। মেলিএকের উচিত শাস্তি হবে, চা খেতে চাইলে নিজে এসে খাক!'

'না, সুরিয়া-খানুম, আপনি যান! আমি একটু সামলে নিই...'

অসীম স্নেহে তার দিকে তাকাল সুরিয়া-খানুম, পেটের মেয়ের দিকে মা যেমন করে তাকায়, তারপর বেরিয়ে গেল। বাকি বাসনগুলো ধুয়ে মেহ্‌রিবান রান্নাঘরটা গুছিয়ে রাখল। দশ-পোনেরো মিনিট বাদে সবকিছু ঝকঝকে তকতকে।

দরজায় ঘণ্টা। চমকে উঠল মেহ্‌রিবান, তার অন্তর তাকে জানাল যে জাকির এসেছে। সারা সন্ধ্যা তার সহ্যশক্তির উপর চাপ পড়েছে বলে সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারল না, ছুটে

গেল বারান্দায়। একেবারে মুখোমুখি ধাক্কা লাগল জাকিরের সঙ্গে।

'মেহ্‌রিবান, তুমি!' মনে হল তার বিস্ময়ের বাঁধ নেই। 'এখানে কী করে?'

এরিমধ্যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সুরিয়া-খানুম, হেসে সে বলল:

'আজ ও হল আমার অতিথি! আমার আর ওঁর!'

জাকির একেবারে হতভম্ব, থতমত খেয়ে করমর্দন করল মেহ্‌রিবানের সঙ্গে। ছোট্ট হাতটা কেঁপে উঠল, কিন্তু মুখে হাসি ফুটেছে। চোখে এসেছে অদ্ভুত একটা দীপ্তি, মনে হল সে সবকিছু দেখেছে, সবকিছু সে জানে, বোঝে...

'মাপ করো, মেহ্‌রিবান, আমারি তোমাকে বলা উচিত ছিল, কিন্তু হল কি...'

'স্থপতি আপাতত বাতুমিতে, কাল ফিরবেন,' বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলল মেহ্‌রিবান। তার কাছে এখন একটা জিনিস শুধু গুরুত্বপূর্ণ — বাপমায়ের কাছে মিথ্যে বলে নিজেকে যেন হেয় না করে জাকির।

'জানি,' আস্তে বলে জাকির আর একটা কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মিথ্যে সাফাই যাতে না গায় তাই সাবধান করে তাড়াতাড়ি মেহ্‌রিবান বলল:

'সুরিয়া-খানুম কারখানায় ফোন করেছিলেন...'

'হ্যাঁ, আমি ওখানে ছিলাম না। স্কুলের একটি বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম। জরুরী কাজ ছিল।'

'আমাদের উৎসবের চেয়েও জরুরী?' ভর্ৎসনার সুরে বলল সুরিয়া-খানুম।

'মাপ করো, মা। আমার একটি বন্ধু ভয়ানক অসুস্থ। ইনফ্লুয়েঞ্জার হিড়িক পড়ে গিয়েছে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে সুরিয়া-খানুম শুধাল:

'কোন বন্ধুটির আবার অসুখ হল?'

'তুমি চেন না, মা...'

জাকিরের সব বন্ধু আর সহকর্মী সুরিয়া-খানুমের চেনা। আর জিজ্ঞেস করা উচিত হবে না বুঝতে পেরে সুরিয়া-খানুম নিঃশব্দে বসার ঘরে চলে গেল।

জাকির ও মেহ্‌রিবান একলা। কোনো কথা নেই। তারপর মেহ্‌রিবান জিজ্ঞেস করল:

'আমার হয়ত এখানে আসা ঠিক হয়নি?'

'তুমি কী! সব ঠিক আছে। মেহ্‌রি... চল বসার ঘরে যাই।'

'ওখানে আমি যেতে চাই না...'

'কেন?'

'সবাই ঠাট্টা করছে যে...'

'কী বলছে?'

'মাথায় যা আসছে তাই বলছে...'

'ওদের বোকামিতে কান দিও না,' অপ্রত্যাশিত কঠোরভাবে বলে উঠল জাকির, 'চল।'

'না, না...'

'তাহলে বাবার ঘরে চল। অনেক ভালো বই আছে, দেখ কিছুক্ষণ। আমি অতিথিদের নমস্কার করে ফিরে আসছি।' পাঠকক্ষের দরজা খুলে মেহ্‌রিবানকে ঢুকিয়ে জাকির তাড়াতাড়ি গেল বসার ঘরে।

কামরাটার দেয়াল জুড়ে বই'এর তাক, ঠেসাঠেসি বই। ঘরটা দেখে নিয়ে মেহ্‌রিবান একটা সোফার হাতায় বসল। টেবিলে খোলা পাণ্ডুলিপি, পাতার ধারে ধারে নানা অঙ্ক আর মন্তব্যের ছড়াছড়ি। আবার তাকগুলোর দিকে চাইল মেহ্‌রিবান। বই'এর গায়ে হেলান দিয়ে অনেক ফটো রাখা হয়েছে। কামিল ও সুরিয়া-খানুমের জীবনের নানা সময়ের ছবি। ছবিগুলো পেশাদারি নয়, যেখানে-সেখানে তোলা, তাদের তোলা হচ্ছে যে দুজনে টের পায়নি বোঝা যায়। একটাতে সুরিয়া-খানুম হেসে স্বামীর চুল ঘেঁটে দিচ্ছে; দুজনে স্নানের পোষাকে সমুদ্রতীরে; মহা আগ্রহে তরমুজের শ্রাদ্ধ চলেছে; ব্যায়ামের আঁটো পোষাক গায়ে হাইজাম্পের একটা পোল পার হচ্ছে সুরিয়া-খানুম; পর্বতারোহীর পোষাকে দুজনে খাড়া পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে কী নিয়ে মহা উৎসাহে আলোচনা চালিয়েছে; মঞ্চ থেকে কথা বলছে সুরিয়া-খানুম,

মুখ হাঁ হয়ে আছে যেন গান গাইছে; শাদা ওভারঅল গায়ে কামিল ল্যাবরেটরিতে কর্মরত, চারিপাশে ছাত্র; নির্মীয়মাণ কারখানার পটভূমিতে আজকের প্রবীণ কামিল চীনে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলছে...

এই দুজন এবং তাদের সুদীর্ঘ অদ্ভুত বন্ধুত্বের কথা ভেবে মেহ্‌রিবান মুগ্ধ। "আমার কপালে কি এমন সুখ আছে?" ভীরুভাবে সে ভাবল, অস্থির একটা ব্যাকুলতায় আড়ষ্ট হয়ে উঠল তার বুক। পাঠকক্ষে একা সে বসে রইল।

বসার ঘরে গিয়ে সবায়ের আগে মানসুরভকে দেখল জাকির। গমনোদ্যত অতিথিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাকিরের সঙ্গে নমস্কারাদির বিনিময় করল। মেলিএক তখন বারান্দায় পা দিয়েছে, জাকিরের কান ধরে বকে উঠল:

'কোথায় টো টো করা হয় শুনি, ছোঁড়া? তোমার গতিক আমার ভালো লাগে না।'

'কেন বলুন তো, মেলিএক-খালা?'

'মেয়েটা এখানে, অথচ তোমার পাত্তা নেই।'

'আমি তো বললাম যে অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলাম।'

'এসব চালাকিতে ভোলবার পাত্রী আমি নই!' চোখ কুঁচকে তারপর কিন্তু গম্ভীর গলায় যোগ করল মেলিএক:

'কিন্তু বলতেই হবে আজ মেলিএক-খালাকে তুমি খুশি করেছ। অত্যন্ত খুশি হয়েছি, এত খুশি যে বলার নয়!'

'তার কারণ কী?'

'বরাবর ভাবতাম তুমি এ বাড়িতে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া আধুনিকাকে নিয়ে আসবে যে নিজের বাপ-মায়ের তোয়াক্কা করে না। কিন্তু এখন দেখছি তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে!'

'হুঁ...'

'দুঃখের বিষয়, তোমার বয়সী ছেলে নেই আমার,' চেঁচিয়ে বলল মিরালিয়েভ। 'সময় মতো মনে হয়নি, আর সবকিছুর মূলে হলেন এই জটাবুড়ী! না হলে নির্ঘাৎ তোমার কাছ থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিতাম আমার ছেলের জন্য। কিন্তু কপালে নেই, নিরুপায়। মেয়েটি বেশ — তোমরা সুখী হও!'

'আমার বুড়োকর্তাকে বিশ্বাস করা যায়, জাকির। ও লোক চেনে,' জাকিরকে চোখ ঠারল মেলিএক।

'লোক না চিনলে হয়ত হাজার হাজার খুপসুরৎ মেয়ের মধ্য থেকে তোমাকে বেছে নিতাম না,' স্ত্রীর কোট ঠিক করে দিতে দিতে দরাজভাবে জানাল মিরালিয়েভ। তারপর হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গেল সে?'

'এই যে!' পাঠকক্ষের দরজা তাড়াতাড়ি খুলে মেহ্‌রিবানকে ডাকল জাকির।

সবাই একে একে মেহ্‌রিবানের কাছে বিদায় নিল, মোটামুটি স্পষ্ট করে প্রত্যেকেই জানান দিল যে তারা চায় সে সুখী হোক। সবাই চলে গেল, রয়ে গেল বাড়ির লোক আর মেহ্‌রিবান। অতিথিদের ছেড়ে দিয়ে কামিল পাঠকক্ষে ঢুকল, সেখানে জাকিরের প্রতীক্ষায় ছিল মেহ্‌রিবান। দুজনের

কথাবার্তা তৎক্ষণাৎ জমেনি। মেহ্‌রিবান জানতে চাইল কয়েকটা ফটো কোথায় এবং কখন তোলা হয়েছে। সাগ্রহে বলতে শুরু করল কামিল।

আর জাকিরের ঘরে মায়ে-ছেলেতে দরকারি কথাবার্তা চলেছে।

'এটা করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।'

'হালে বাড়িতে কি তুই খুব বেশি থাকিস?'

'তামাশা বটে!' বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল জাকির।

'কথাটা কী করে মুখে আনতে পারলি, জাকির? এ ক'মাস তো সন্ধ্যেবেলায় কোথায় সরে পড়িস আর বাড়িতে থাকলে প্রায় সারা সন্ধ্যে টেলিফোনে ওর সঙ্গে কথা বলিস, এমনকি রাত্তিরেও বাদ দিস না। তুই নিজেই বল, এ থেকে আমরা কী ভাবতে পারি? আর এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হঠাৎ তামাশা হয়ে গেল! তোকে আমি বুঝি না!'

'মা, আমি তা বলতে চাইনি। শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে আমার অজানতে ওকে নেমন্তন্ন করা উচিত হয়নি।'

তিক্ত একটা নিশ্বাস নিল সুরিয়া-খানুম:

'ছি, জাকির! তোর মধ্যে আমাদের ছিটেফোঁটা নেই, না আমার না তোর বাপের...'

আগেকার মতো বিরক্তিভরে জাকির বলল:

'কেন, আমার অপরাধটা কী?'

'...তোর হৃদয় নেই, জাকির, এই যা!'

নিজেকে সামলাবার চেষ্টা আবার করল জাকির:

'এ ক'দিন ভয়ানক ক্লান্ত আমি, মা!'

সুরিয়া-খানুমের গলায় হঠাৎ এল অনুনয়ের একটা সুর:

'জাকির, আমাদেরও তো নিজেদের স্বপ্ন আছে! তোর বয়সে আমাদের ছ বছর বিয়ে হয়েছে। তোর মতলবটা কী?'

চমকে উঠে মা'র দিকে তাকাল জাকির।

'আমার বিয়ে দেবার উপক্রম করছ না কি?'

'না, কিন্তু মেহ্‌রিবান চমৎকার মেয়ে। অবশ্য সুন্দরী নয়, গড়নটা ছোট্ট, তবে এত মিষ্টি, এত নির্মল ওর চরিত্র! আজ আমাদের সবায়ের মন ও কেড়ে নিয়েছে, সবাই ওকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত!'

জাকির একেবারে হতচকিত। মেহ্‌রিবানকে ভালোবাসা যায়, আদর করা যায়, সাহায্য করা চলে, বুলেভারে বসে মধুর কথা বলা চলে, ওর অদ্ভুত গল্প শোনা চলে, সবই চলে, সমস্তটা স্বাভাবিক, কিন্তু ওকে বাগ্‌দত্তা ভাবা — এটা একেবারে ওর মাথায় ঢোকেনি। বাগ্‌দত্তা শেষ পর্যন্ত ঘরের বউ হয়, কিন্তু মেহ্‌রিবানের সম্পর্কে এটা তার মনে হল সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। "ও নিজে কী ভাবে? হয়ত সম্ভাবনাটা ওর ভালো লাগে?" অতিথিরা ওকে নিয়ে ঠাট্টা করছে যখন বলল তখন লাল হয়ে ওঠে, ওকে দেখায় ভয়ানক বিব্রত, কিন্তু চটেছে বলে মনে হয়নি। মেহ্‌রিবান বাগ্‌দত্তা, মেহ্‌রিবান স্ত্রী, বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে মেহ্‌রিবান, প্রতিদিন রাত্রে তার পাশে ঘুমোয়

মেহ্‌রিবান… সকালবেলায় অর্ধবসনে, এলোমেলো চুলে, ফোলা ফোলা মুখে মেহ্‌রিবান তার সামনে চলাফেরা করছে আর বলছে — গলায় সেই স্নিগ্ধ স্পন্দন এরিমধ্যে উবে গেছে: “কাজ থেকে ফিরতি পথে সাবান কিনো তো” না “আলু খতম…” বা ওই ধরনের কিছু…

‘মেহ্‌রিবান চমৎকার মেয়ে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে একেবারে খাপ খাবে না! ওর সহজ সরল স্বভাব আমারো ভালো লাগে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি সারা জীবন ওকে উৎসর্গ করব। মানুষের তো একটাই জীবন! ওর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার জন্য পরে ওকে ঘৃণা করতে আমি চাই না। ছেলেবেলা থেকে কষ্ট পেয়েছে, আবার ওকে ব্যথা কেন দেব, আবার একটা ঘা দেব কেন?’

ছেলের অনমনীয় চরিত্র মা ভালোভাবে জানে। তার কথায় কঠোর সত্যের আভাস পেল সুরিয়া-খানুম কিন্তু তবু জিজ্ঞেস করল:

‘তাহলে এতদিন কেন ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছিস, কেন তোকে ভালোবাসতে দিলি ওকে?’

‘আমাদের দেখা হবার অনেক আগে থেকেই ও আমাকে ভালোবাসে; কথাটা হেঁয়ালির মতো ঠেকবে, কিন্তু কথাটা সত্যি।’

‘বেচারী মেয়েটা! শেষ পর্যন্ত কী হবে?’

'জানি না...'

'ওর তো কেউ নেই। কাকে দুঃখের ভার দেবে, কার বুকে মুখ রেখে কাঁদবে?' সুরিয়া-খানুমের চোখে জল এল। 'মা নেই, বাপ নেই... কেউ নেই! তুই কী করেছিস বুঝতে পারছিস, জাকির, বুঝতে পারছিস?'

ঠোঁট চেপে উঠে দাঁড়াল জাকির।

'এ নিয়ে আর কথা না বলাই ভালো।'

ছেলের দিকে ব্যথা আর বিষাদভরে তাকিয়ে মাথা নাড়ল সুরিয়া-খানুম।

'মানুষ কী করে এত নিষ্ঠুর হতে পারে!' উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মা। মেহ্‌রিবানের কাছে গেল না পর্যন্ত, সটান শোবার ঘরে গিয়ে খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল সুরিয়া-খানুম।

পাঠকক্ষের দরজা খুলে দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল জাকির। কামিল কী যেন একটা গল্প বলছে মেহ্‌রিবানকে, মেহ্‌রিবান হাসছে। জাকিরকে দেখে তার হাসি থেমে গেল। ছেলের দিকে ফিরল কামিল।

'দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ভেতরে আয়!'

'না, বাবা, রাত হয়ে গেছে আর মেহ্‌রিবান থাকে অনেক দূরে।'

অতিথিদের যে নিজে থেকে বিদায় দেওয়া অনুচিত তা ছেলেকে বলতে গিয়ে কামিলের মনে হল হয়ত দুজন একলা

থাকতে চায়, ওদের ব্যাঘাত ঘটানো ঠিক নয়। মেহ্‌রিবানকে জিজ্ঞেস করল:

'শীগগিরই আবার আমাদের দেখা হবে আশা করি?'

জাকিরের দিকে তাকাল মেহ্‌রিবান। জাকির সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথা তুলল:

'বাবা, জানো, আসার পথে প্রকাশালয়ের ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা হল। তোমাকে বলতে বললেন যে তোমার বইয়ের প্রথম খণ্ডের প্রুফ কাল হয়ে যাবে।'

কথাগুলো যেন কামিলের কানে গেল না। আবার সে মেহ্‌রিবানকে শুধাল:

'তাহলে কবে আবার দেখা হচ্ছে?'

'ঠিক জানি না... আমার কাজ আছে, স্কুল আছে,' আবার জাকিরের দিকে তাকাল সে, তারপর হঠাৎ সানন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'যখন আপনার ইচ্ছে! আজ তাহলে আসি!' বারান্দায় গিয়ে বসার ঘরের দিকে তাকাল মেহ্‌রিবান।

'সুরিয়া-খানুম কোথায়? যাবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'সুরিয়া!' হাঁক দিল কামিল। 'আমাদের অতিথি চলে যাচ্ছেন!'

'মা'র ভয়ানক মাথা ধরেছে,' শুকনো গলায় জানাল জাকির। তার গলার সুরে কিছু একটা গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে কামিল ছেলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দ্রুত

পায়ে বেরিয়ে গেল।

‘চল!’ মেহ্‌রিবানের হাত ধরে বলল জাকির।

‘আর সুরিয়া-খানুম! ওঁর কাছে তো বিদায় নিইনি। ওঁর কী হয়েছে?’

‘কিছু নয়, আপনা থেকে ঠিক হয়ে যাবে।’ সদর দরজা খুলল জাকির।

কী ঘটেছে তার অর্থ না বুঝে মেহ্‌রিবান শেষবার বসার ঘরের দরজার দিকে তাকাল, তারপর জাকিরের অনুগমন করল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আবার একবার জিজ্ঞেস করল মেহ্‌রিবান:

‘তবু, সুরিয়া-খানুমের কী হল?’

‘বললাম তো, কিছু না। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়া আর কি — এই মেঘ, এই রোদ।’ মেহ্‌রিবানের খটকা দূর করার চেষ্টা করল জাকির।

কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে কোনো রকম ঝগড়া যে হতে পারে তা কল্পনাও করতে পারে না মেহ্‌রিবান।

মোড় পর্যন্ত দুজনে গেল। একটা গাড়ি থামাবার জন্য জাকির হাত তুলেছে, মেহ্‌রিবান তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে বলল:

‘না, হেঁটে যাই চল! কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি।’

জাকিরের সন্দেহ নেই যে হেঁটে গেলে দুজনের সম্পর্ক নিয়ে কথা উঠবে নির্ঘাৎ, কেন সে আর ফোন করে না, দেখা

করে না। কিন্তু আজ না হয় কাল কথাটা উঠবেই... ব্যাপারটায় ছেদ টানতে হবে, যত শীগগির তত ভালো দুজনের পক্ষে। তাই হেঁটে যেতে সে রাজী হল।

'বেশ, তাই চল।'

রাত বারোটা বাজে।

রাস্তায় দেরিতে ফেরা পদচারীদের শব্দ ক্বচিৎ কখনো, হলদে আলো জেবলে গাড়ি আসছে এক একটা। আগুনের আলোয় উজ্জ্বল সহর।

রাস্তা আর স্কোয়ার পার হয়ে দুজনে আস্তে আস্তে উঠল কমিউনিস্ট স্ট্রীটে। নিজের বিষয়ে মেহ্‌রিবান বলল জাকিরকে, বলল তাদের ওখানে তার কত ভালো লেগেছে। সে কথা বলছে সহজে, অনায়াসে, এমন কি উৎফুল্লভাবে, যেন সবকিছু আগেকার মতোই আছে, কিছু বদলায়নি।

"এইবার শুরু হবে, হল বলে," সারা পথ অস্থির প্রতীক্ষায় রইল জাকির। কিন্তু মেহ্‌রিবান একেবারে অন্য বিষয়ে কথা বলছে।

শেষ পর্যন্ত মেহ্‌রিবানের বাড়ি এসে পড়ল। বরাবরকার মতো পা দশেক দূরে দুজনে দাঁড়াল। দুজনেই চুপচাপ। কী যেন একটা মনে পড়েছে এমনভাবে মেহ্‌রিবান বলল:

'জানো, জাকির, আজ তোমাদের ওখানে জীবনে প্রথম মদ খেলাম... অবশ্য এক ঢোক মাত্র, তোমার মা-বাবার স্বাস্থ্য কামনা করে। ওঁরা চমৎকার লোক, এত সহৃদয়! তোমাকে হিংসে

হয়, জাকির। আমার এ-রকম মা-বাপ থাকলে আমি হয়ত একটা কিছু হতে পারতাম!'

জাকিরের মনে হল মেহ্‌রিবান যেন তার মনের কথা জেনে বলছে তাকে: "তুমি আমার সম্বন্ধে যা ভাবো আমি সব জানি!" আর বলছে শান্তভাবে, ভর্ৎসনার রেশ নেই, অশ্রুজল নেই!

'জীবন বড়ো জটিল...' গোমড়া মুখে প্রয়াস করে শুরু করল জাকির।

হঠাৎ মেহ্‌রিবান কেন যেন উৎফুল্ল বেপরোয়াভাবে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'মনে আছে, একবার তুমি বলেছিলে যে আমার জীবনের পাতাগুলো উল্টে দেখতে চাও? ওল্টানো হয়ে গিয়েছে বুঝি?'

জাকিরের মুখ কালো হয়ে উঠল:

'হুঁ... মনে আছে, আমি আরো বলেছিলাম যে বইটার শেষটা কে যেন নিষ্ঠুর হাতে ছিঁড়ে নিয়েছে।'

মেহ্‌রিবান স্থির গর্বের সঙ্গে মাথা তুলে প্রতিবাদ জানাল:

'না, জাকির, আমার আসল জীবন সবে শুরু হয়েছে। তুমি মনোযোগ দিয়ে বইটা পড়নি... তুমি বইটার এক অক্ষরও জানো না!'

আর বাস্তবিক, যে মেহ্‌রিবান এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সে জানে না। তাদের পরিচয়ের প্রথম দিনগুলোর সেই দুর্বল, ভীরু, ইচ্ছাশক্তিবিহীন মেয়ে সে নয়। অবশ্য চুল

তার তেমনি ছোট্ট, পাতলা, মুখে সেই বিশেষ হাসি, ঠোঁটের কোণ বেঁকা, আর নিশ্বাস নেবার আগে তেমনি কম্পিত নাসারন্ধ্র। কিন্তু এখন তার মধ্যে অনুভব করা যায় আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তা, তার কালো চোখের নরম দৃষ্টিতে আত্মমর্যাদা ও সংযমের স্পষ্ট আভাস...

'বিশ্বাস করো, মেহ্‌রিবান, আমি শুধু চাই তুমি সুখী হও,' জাকির তার চোখে চোখ রাখল। বিষণ্ণ হাসি হাসল মেহ্‌রিবান। না, ও জানে, ওর জানতে কিছু বাকি নেই। কেন ও কাঁদে না, অনুনয় করে না, কেন ও তাকে পুরোনো সব প্রতিশ্রুতি আর ঝকঝকে বুলির কথা মনে করিয়ে দেয় না? কেন?

'আমাদের আর দেখা হবে না, জাকির?' ঠিক আগেকার মতো হেসে জিজ্ঞেস করল মেহ্‌রিবান।

"সময় হয়েছে বলার!" নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে বলল জাকির। "আমি তুলিনি, ও নিজেই কথাটা তুলেছে, নিজেই দণ্ড মেনে নিচ্ছে! হয়ত এটা একটা ফিকির, নিজের উদারতায় আমাকে অবশ করে দেবার চেষ্টা? যাই হোক, জবাব দিতেই হবে। যদি জিজ্ঞেস করত কাল দেখা হবে কি না, তাহলে হয়ত বলতাম যে আমি ব্যস্ত আছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ও তা জিজ্ঞেস করেনি: ও সব বোঝে, আমার চোখে চোখ রেখে কী আশ্চর্য শান্ত ও ধীরভাবে জিজ্ঞেস করল 'আমাদের আর দেখা হবে না?'"

'না!' অতটা নিষ্ঠুরভাবে সে বলতে চায়নি। দৃঢ়ভাবে, প্রায় অভব্যের মতো কথাটা উচ্চারণ করল সে, যেন তার ভয় গলা কেঁপে যাবে, উত্তরটা শোনাবে ভীরুর মতো, অপরাধীর মতো, যথেষ্ট দৃঢ় শোনাবে না...

ফিরে মেহ্‌রিবান ফটকের দিকে চলল।

'না, দাঁড়াও!' জাকির পিছনে দৌড়িয়ে পথ আটকাল। 'দাঁড়াও, মেহ্‌রিবান, এভাবে যেও না... যাওয়া উচিত নয়! আমাকে ভেবেচিন্তে দেখতে হবে, যাচিয়ে নিতে হবে নিজেকে! আমি বুঝি না, সত্যি বুঝতে পারি না! আমার মনে আর বুকে সবকিছু এখন গোলমেলে হয়ে গিয়েছে! আমাকে সময় দাও, তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে দাও, নিজেকে যাচাই করে দেখব, পরীক্ষা করব... যদি নিজে থেকে তোমার কাছে ফিরি, তার মানে চিরকালের জন্য ফিরব। যদি না ফিরি, যদি না ফিরি...' ওর গলা আবার নিষ্ঠুর শোনাল, 'তার মানে তোমাকে আমি বরাবর ঠকিয়েছি, নিজেকে ঠকিয়েছি, তার মানে, তোমাকে ভালোবাসিনি!'

"সব শেষ!" গভীর নিশ্বাস নিল জাকির, তবু নড়তে পারল না সেখান থেকে। কেন তা নিজেই জানে না, সে ডাকল:

'মেহ্‌রি...'

সাড়া দিল না মেহ্‌রিবান। তার নিস্পন্দ দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ, সমুদ্রতীরে অগণিত আলোর উপর। অবশেষে তার চোখে পড়ল বয়ার দপদপে আলো, সরু সরু ছুঁচের মতো শান্ত

সমুদ্রের জলকে ফুঁড়ছে তারা... দুজনের মুখে আর কোনো কথা নেই...

"এই ভালো," ভাবল জাকির। চট করে ঘুরে সে চলল।

"কিন্তু, ও তো আমাকে ভালোবাসে... ভালোবাসে! এখ্‌খুনি মনে পড়বে, তখন চেঁচিয়ে আমাকে ডাকবে, পিছু পিছু দৌড়বে, অজ্ঞান হয়ে যাবে! কিন্তু আশ্চর্য, তেমন তো কিছু করল না! ও তো দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে, ঠিক আগেকার মতোই! হয়ত আমাকে ভালোবাসে না? প্রথম প্রথম কারখানায় একটা শক্ত খুঁটির দরকার ছিল শুধু?"

মেহ্‌রিবানের স্থির ভাব একদিকে জাকিরকে যেমন স্বস্তি দিল তেমন অন্য দিকে তার আত্মপ্রেম জোর একটা ঘা খেল।

মেহ্‌রিবান ডাকল না, পিছনে দৌড়ল না, চেঁচাল না, মূর্ছা গেল না...

দৃঢ় পদক্ষেপে আরো দূরে চলে গেল জাকির, মোড় নিয়েছে প্রায়, অস্ফুট একটা আর্তধ্বনি কানে এল। হঠাৎ তার আবেগ হল ফেরার, কিন্তু না। ফিরল না সে... গতিবেগ শুধু বাড়িয়ে দিল...

"সব শেষ!" আর একবার স্বস্তির নিশ্বাস নিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

১৪

কারখানার উপর, সমুদ্রে কাস্তের মতো প্রসারিত তটের উপর ভাপের ঝিকিমিকি। তেলজাত জিনিসবাহী ট্যাঙ্কের সুদীর্ঘ লাইনের অবিশ্রাম ঘড়ঘড়, কানায় কানায় পেট্রোল ভরা ভারি ট্যাংকার ঘাটে এসে তীক্ষ্ণ ডাকে কারখানাকে অভিনন্দন জানায়; প্রকাণ্ড পাইপসুদ্ধ বয়লারের শান্ত একটানা নিশ্বাস। বিরাট মহান দৃশ্যটির সর্বত্র শ্রমের উদ্যম-উচ্ছ্বাস।

মেহ্‌রিবানের আজকাল মনে হয় শৈশব থেকে সে এখানে আছে, বড়ো হয়েছে কারখানাতেই। কারখানার তুলনায় সে সমুদ্রে জলবিন্দুর মতো, কিন্তু তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, যা মাইক্রোফোনে ক্রমাগত বলে চলে, "তিন নং... তিন নং...", সস্নেহে সংক্ষেপ-করা তার নাম "মেহ্‌রি" এরিমধ্যে পাইপ, যন্ত্রাগারের বুরুজ, রুপালি তৈলাধার আর তেল-ঢালা সাঁকোয় কীর্ণ এই বিরাট, অবিরাম স্পন্দিত, নিদ্রাহীন জগতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টায় এক্‌স্‌চেঞ্জের ছোট্ট কামরায় সে প্রকাণ্ড কারখানাটির নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে, সমস্ত কারখানাটা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে চোখের সামনে। কারখানাও জানে তাকে, জানে টেলিফোনের অন্য মেয়েদের। সবাই জানে তার নাম, তার গলা শুনেছে সবাই। কারখানার কঠোর সুন্দর কর্মজীবনে সে নিজের যোগ্য

একটা স্থান অধিকার করেছে। তার নিজস্ব জগৎ আছে, আছে নিজের আনন্দ ... আর আছে দুঃখ ... দুঃখ?

জাকির আর ফেরেনি। সে দিনের পর ফোন করেনি। এমন কি কারখানার আভ্যন্তরীণ কাজে বাধ্য হয়ে যখন ফোন করে তখন মেহ্‌রিবানের গলা কানে এলে এমন ভাব দেখায় যেন তাকে চেনে না। নীরস সরকারী গলায় ল্যাবরেটরি বা যন্ত্রাগার দিতে বলে। মাঝে মাঝে "তিন নং" শুনলেই রিসিভার নামিয়ে রাখে। তখন মেহ্‌রিবান আবার তাকে ডেকে সহজে, কাজের খাতিরে জিজ্ঞেস করে, "তোমার কাকে চাই, জাকির?" জাকিরের তখন বলার সাহস থাকে না যে সে ফোন করেনি। অবশ্য সবচেয়ে বেশি তার দরকার নক্‌সা-বিভাগকে, কিন্তু মুশকিল এই যে সেখানে ফোন করতে হলে মেহ্‌রিবান বা তার বান্ধবীদের লাইন ছাড়া গত্যন্তর নেই। সাধারণত যতক্ষণ না অন্য টেলিফোন- মেয়ে পায় ততক্ষণ সে ফোন করে চলে, তারপর নম্বরটা জানায়। ফিকিরটা ধরা পড়ত মেহ্‌রিবানের কাছে — পাশের সুইচবোর্ডে কী চলেছে সেটা তার বিলক্ষণ জানা, সে দেখত যে দিনে কয়েকবার জামিলিয়া বা সিমুজার চার নং ডিপার্টের ম্যানেজার আর নক্‌সা-বিভাগকে যুক্ত করে।

জাকিরের অধৈর্য লাগে। মেহ্‌রিবান তার সঙ্গে টেলিফোনে এত সহজে, প্রায় বন্ধুর মতো কথা বলে যেন কিছু ঘটেনি, এতে সে আশ্বস্থ থাকে না। তার মনে হতে লাগল যে বিচ্ছেদটা তার কাছে যত যন্ত্রণাকর ততটা মেহ্‌রিবানের কাছে নয়।

"ও কী ধরে নিয়েছে যে শেষ পর্যন্ত ওর কাছে ফিরে যাব? ও কি জানে না যে সেটা অসম্ভব, কখনো ঘটবে না সেটা? তাছাড়া ও কত অভিমানী — তুচ্ছ ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে কেঁদে ফেলত — কত বার না ঠোঁটে ওর অশ্রুজল অনুভব করেছি! আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াটাকে এত স্থিরভাবে কী করে নেয়? এই আত্মসংযমের রহস্যটা কী?"

যত ভাবে তত বদলে যায় মেহ্‌রিবানের প্রতি বিচ্ছেদের আগেকার সেই মনোভঙ্গীটা। পরিবর্তনটা এল এত অলক্ষিতে যে সে প্রায় টের পেল না, তবু পরিবর্তনটা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ হল। মেহ্‌রিবানের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার প্রতি হৃদয়ের সমস্ত দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে সে ভাবে যে তার ও নিজের কাছে মিথ্যা বলার ভারমুক্ত হয়েছে। এখন আর জারাঙ্গিসকেও মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তবু তাতে করে নতুন কিছু দেখা দিল না, দুজনের সম্পর্ক শুদ্ধতর হল না। অবশ্য সেই অস্থির ভাব আর নেই, মেহ্‌রিবান বাধা দিচ্ছে বলে তার প্রতি সেই বিরাগ অদৃশ্য হয়েছে, কিন্তু স্বস্তি মিলল না, বুকে রয়ে গেল বিরাট একটা শূন্যতা। সরে গেল মেহ্‌রিবান, জাকির এবং জারাঙ্গিস এখন মুখোমুখি।

জারাঙ্গিসের সঙ্গে যত দেখা হয় তত আনন্দের বদলে জাকির কী একটা যেন অনুভব করে, সেটা প্রায় আতঙ্কের সামিল। জাকিরের সঙ্গে মেয়েটার ব্যবহার এমন দুঃসাহসিক যে জাকিরের ক্রমশ মনে হল সে তার কাছে বাঁধা। দৃঢ়চিত্ত

উদ্যমী জাকিরকে এ ভূমিকায় অদ্ভুত ঠেকে। ঘনিষ্ঠতার শুরুতেই জারাঙ্গিস তাকে করতলগত করার চেষ্টা করলে জাকির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে দাঁড়াত। কিন্তু জারাঙ্গিস পাকা মেয়ে। সে এত হিসেব করে, এত সূক্ষ্মভাবে এবং জাকিরের চোখে সুন্দরভাবে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করত যে হাতের মুঠোয় আনার তার এই একাগ্র প্রয়াসকে মজার একটা খেলা মনে হল জাকিরের। কখন খেলা আর খেলা রইল না সেটা তার নজর এড়িয়ে গেল, যখন খেয়াল হল তখন সে বন্দী। আগে যে সব জিনিস তার জীবনকে ভরিয়ে রাখত, তার সবকিছু থেকে তাকে ছিনিয়ে আনল জারাঙ্গিস, নিজের সঙ্গে যোগাযোগ নেই এমন সবকিছুর প্রতি জাকিরের আকর্ষণকে সে ক্রমশ নিভিয়ে দিল, ডিপার্টের প্রতি, নতুন যন্ত্রাগার নির্মাণের প্রতি, বাড়ির প্রতি আকর্ষণকে। সেটা বুঝে তার মনে ক্রমশ জমে উঠল তীব্র একটা প্রতিবাদ। জারাঙ্গিসের সঙ্গে সে আরো সতর্ক হল ...

এসময় এক্‌স্‌চেঞ্জের মেয়েদের মধ্যেও কয়েকটা পরিবর্তন ঘটে। ছুটি নিয়ে ইবাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে ভালিদা। মা তাকে যেতে দেবে না পণ করে, তাই রেজিস্ট্রী অফিসে প্রথম যেতে হয়, দুজনে বেড়াতে গেল দম্পতি হিসেবে; লেইলা পোয়াতি-ছুটিতে আছে; জামিলিয়া গিয়েছে মস্কোয় সাহিত্য ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা দিতে। মেহ্‌রিবানের সিফ্‌টে এখন তিনটি নতুন মেয়ে, তাই কাজের আসল চাপ পড়েছে পুরোনো

কর্মীদের উপর — মেহ্‌রিবান, মাহ্‌বুবা, সিমুজার এবং নাজিলার উপর।

একদিন মেহ্‌রিবানকে ডেকে সিমুজার বলল:

'মেহ্‌রিবান, নক্‌সা-বিভাগে ছকটা দিয়েছিলে মনে আছে? সেটার কী হল?'

ঠোঁট চেপে মৃদুকণ্ঠে বলল মেহ্‌রিবান:

'জানি না... হয়ত তৈরি হয়েছে।'

'তাহলে গিয়ে নিয়ে এস। নতুন মেয়েদের দেখিয়ে দিতে হবে।'

'আচ্ছা, কাজের পর কাউকে বলব গিয়ে নিয়ে আসতে...'

সিফ্‌ট শেষ হলে মাহ্‌বুবা নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে করিডরের একটা কোণে মেহ্‌রিবানকে ডেকে নিয়ে গিয়ে উত্তেজিতভাবে বলল:

'মেহ্‌রি, তুমি সবকিছু যে আমাদের কাছে গোপন কর সেটা আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে — তোমার সুখ, তোমার দুঃখের কোনো ভাগ দাও না। তোমার ব্যাপারে প্রথমে আমি নাক গলাতে চাইনি, কিন্তু এখন সর্বনাশের দোরগোড়ায় তুমি পা দিয়েছ। সাবধান, মেহ্‌রি!'

'কী যে বলছ বুঝতে পারছি না!' বিরক্তির সঙ্গে ঘুরে পা বাড়াল মেহ্‌রিবান। কিন্তু মাহ্‌বুবা দৃঢ় হাতে তার কাঁধ চেপে ফেরাল:

'থাক, অনেক হয়েছে,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'লুকোচুরির

কিছু নেই, পরিণামটা তোমার পক্ষে খুব খারাপ হতে পারে! আমি নিজের চোখে ওদের দেখেছি সমুদ্রতীরের বুলেভারে, উইলোগাছের তলায় বেঞ্চিটায়; ওদের জড়াজড়ি করতে দেখেছি, আর একবার শুধু নয়! আজকাল ওরা রোজ সন্ধ্যেবেলায় ওখানে যায়!'

সংবাদটায় অবাক হবার ভান দেখাল মেহ্‌রিবান।

'কোন বেঞ্চিটা? কোন উইলো? কী দেখেছ?'

'জাকির আর নক্‌সা-বিভাগের সেই মেয়েটাকে!'

'তাতে আমার কী যায় আসে?'

'ছি, মেহ্‌রিবান!' সক্রোধে বলে উঠল মাহ্‌বুবা, মুখ তার লাল হয়ে উঠল। 'আমি ভাবতাম তুমি বন্ধু লোক! তোমার আনন্দের কথা আমাদের বলনি, এখন দুঃখ চাপলে কী হবে! সেই বেঞ্চিটা যেটায় কিছু দিন আগে তোমাকে আর জাকিরকে দেখি। আর এইমাত্র ও জাকিরকে টেলিফোন করে ডেকেছে!'

"আমাদের দুজনকে তাহলে দেখেছে? মাহ্‌বুবা সব জানে!" মেহ্‌রিবানের মাথায় ঝিলিক দিল কথাটা।

অস্থির একটা নিশ্বাস নিয়ে সে করিডরে ছুটে চলে গেল বহির্পথের দিকে...

নক্‌সা-বিভাগের দোর ঠেলে জাকির যখন ঢুকেছে তখন জারাঙ্গিস নক্‌সা-বোর্ড থেকে সরে এসে হাত ছড়িয়ে সমস্ত শরীর বেঁকিয়ে বেড়ালের মতো অলসভাবে আড়মোড়া ভাঙছে।

জাকিরকে দেখে হেসে সে হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু তার বেজার মুখ দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল:

'কী হল তোমার?'

'কী হবে?' শুকনো গলায় পুনরুক্তি করল জাকির।

কাষ্ঠহাসি হেসে জারাঙ্গিস বলল:

'চেহারাটা চোরের মতো দেখাচ্ছে।'

'হয়ত ঠিক তার উল্টো।'

'তার মানে? তোমাকে লুঠে নিয়েছে না কি?'

উত্তর দিল না জাকির। চুপচাপ ঘরে পায়চারি করে হঠাৎ কঠোরভাবে দাঁড়াল জারাঙ্গিসের সামনে।

'শোন, জারাঙ্গিস! এ কারখানা তোমার ছেড়ে দেওয়া ভালো।' সচকিত হল জারাঙ্গিস, কিন্তু জোর করে মুখে বিকৃত হাসি এনে বলল:

'ছেড়ে যাব? আমার নক্‌সাগুলোর কী হবে?'

'যে কোনো নক্‌সা-কারিকা কাজটা করতে পারে। ওটা কিছু নয়, সেটা তুমি জানো।'

এত জোরে মাথা ঝাঁকাল জারাঙ্গিস যে সমস্ত চুল লাফিয়ে উঠল।

'তোমার কি নতুন প্রেমিকা জুটেছে?' বিদ্বেষভরে সে শুধাল।

জাকির চুপ করে রইল, যেন কথাটা কানে যায়নি। তার দৃষ্টি জারাঙ্গিসকে পেরিয়ে সামনে চলে গেছে।

'হয়ত সেই পুরোনো রতনটি জুটেছে?' হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল জারাঙ্গিস।

'জানো জাকির, তোমার হবু-স্ত্রীর কথা ভেবে আমার হিংসে হচ্ছে না।'

'কেন?'

'তার কারণ, নিত্যি নতুন অদ্ভুত উদ্ভাবন না করলে ওর সঙ্গে এক বিছানায় তুমি শোবে না!'

'তোমাকে উদ্ভাবন করতে কেউ বলেনি। কিন্তু নিজের কাজকে বাস্তবিক ভালোবাসলে, মন দিয়ে করলে তোমার নিজেরি ভালো হত।'

'তা বই কি? আমি মন না দিয়েও হামেশা ভালো কাজ পেতে পারি। তাই সকলের নজরে পড়ি। শ্যাওড়াগাছের পেত্নীরা অন্যদের নজরে পড়ার জন্য মাথা ঘামাক গে!'

'যত সব বড়ো বড়ো বুলি!' ভুরু কুঁচকে উঠল জাকিরের। 'বুদ্ধির কী দৌড়!'

সঙ্গে সঙ্গে জারাঙ্গিস শরীর টান করে গুটি গুটি এগোল বেড়ালের মতো, যেন এক্ষুণি লাফাবে, চোখে অশুভ আগুনের ঝিলিক।

'বটে, আমার বুদ্ধি নেই! এ কামরায় আনাগোনার কথা এরিমধ্যে ভুলে গিয়েছ! ভুলে গিয়েছ যে আমারি জগতে তুমি বাঁচতে!'

তার চোখ দীপ্ত হয়ে উঠেছে; উজ্জ্বল, অসহ্য সুন্দর

বিদ্বেষভরা মুখ ঘিরে চূর্ণ কুন্তল আর কানের দুল বুনো নাচন শুরু করেছে।

তার গলার স্বর পেঁছিল সপ্তমে। কেউ যদি শোনে, কেউ যদি এসে পড়ে... সেটাতে জাকিরের সবচেয়ে ভয়।

'কী পাগলামি হচ্ছে...' শান্ত করার চেষ্টায় বলল জাকির, 'কী পাগলামি হচ্ছে, মেহ্রি...'

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। জারাঙ্গিসের চোখ ছোট হয়ে গেল কুৎসিতভাবে।

'এই ব্যাপার তাহলে! তাই আমাকে কারখানা ছেড়ে যেতে বলা হচ্ছে! তাহলে তুমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচ? এখন বুঝেছি এ কদিন তোমার মনে কী চলেছে!'

'জারা, কেন বোকামি করছ...'

'না, আমি বুঝে নিয়েছি! মনের কথা বেরিয়ে আসে মুখে! এখন সব বুঝে ফেলেছি!'

'বিশ্বাস কর, এমন কি স্বপ্নে পর্যন্ত ওকে দেখি না!'

জাকিরের কাছে গিয়ে, দুহাতে তার কাঁধ চেপে, রুদ্ধশ্বাসে জারাঙ্গিস উচ্চ কণ্ঠে বলল:

'ঠিক বলছ? ঠিক? আমার চোখের দিকে তাকাও তো? মা'র দিব্যি করে বল যে ওর নামটা হঠাৎ করেছ!'

'মা'র দিব্যি!'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জাকিরের বুকে মাথা রাখল জারাঙ্গিস। ঠিক সে মুহূর্তে দরজায় একটা হালকা টোকা.

উত্তরের অপেক্ষা না করে সটান ঘরে ঢুকল মেহ্‌রিবান। জাকির ও জারাঙ্গিস পরস্পরের কাছ থেকে সরে এল।

'নমস্কার!' কম্পিত গলায় বলল মেহ্‌রিবান।

প্রতিনমস্কার করল না জাকির। নিজেকে তার অত্যন্ত ছোট্ট মনে হল। কিন্তু জারাঙ্গিস বিদ্বেষে বেজায় খুশি। মেহ্‌রিবানকে প্রতিনমস্কার না করে ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞাভরে জিজ্ঞেস করল:

'এখানে হঠাৎ কী মনে করে?'

'সিমুজার সেই নক্‌সাটা চাইছে... আমার ছকটা।'

দেয়ালের সামনের তাকটার কাছে গিয়ে হাতড়ে নক্‌সাটা পেল জারাঙ্গিস। সেটা বাড়িয়ে দিল মেহ্‌রিবানকে।

'এই নাও। একটা কথা। বেরোবার সময় সাবধানে বেরিও, দরজার কাঁচটা ভাঙে না যেন,' খোঁটা দিয়ে বলল সে।

কিছু না বলে জাকিরের দিকে ফিরল মেহ্‌রিবান।

'বিরক্ত করেছি বলে কিছু মনে কোরো না, জাকির!' অস্ফুট কণ্ঠে সে বলল।

মেহ্‌রিবান বেরিয়ে গেল। জারাঙ্গিস নিজে দরজাটা বন্ধ করে তাতে হেলান দিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, পিছনে হাত মুড়ে দরজার হাতলে রেখে।

'তোমার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই, সত্যি তো?' আবার শুধাল সে।

'হ্যাঁ, ঠিক যেমন তোমার সঙ্গেও নেই...' কঠোর গলায় জবাব দিল জাকির।

সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গেল জারাঙ্গিস, হাঁটুদুটো অবশ হয়ে এল তার। দরজা ছেড়ে অনিশ্চিত পায়ে জাকিরের দিকে এগিয়েছে, কিন্তু জাকির তাকে থামাল। যেন আশ্রয় খুঁজছে এমনভাবে হাতদুটো প্রসারিত করে অচেনা, নিষ্ঠুর গলায় সে আবার বলল:

'কারখানা ছেড়ে যেতে হবে তোমাকে।'

'যদি না যাই?'

'তাহলে আমি দেখব যাতে তোমাকে ছাড়িয়ে দেয়। ছাড়িয়ে দেবার কারণ যথেষ্ট আছে — তোমার নক্‌সা প্রায়ই কাজ-সারা গোছের হয়, বিচ্ছিরি ভুলও থাকে। নিজে থেকে ছেড়ে দিলেই ভালো।'

পা কেঁপে উঠল জারাঙ্গিসের, নিজের টুলে বসে পড়ে হঠাৎ ককিয়ে উঠে টেবিলে মাথা রেখে ফোঁপাতে লাগল। কাঁধদুটো থরথর কাঁপছে, সুন্দর চুলের ঢাল ছড়িয়ে পড়েছে নক্‌সায়। ফুঁপিয়ে তোতলাতে তোতলাতে সে বলল:

'কেন মরতে কারখানায় এসেছিলাম! কেন মরতে তোমার সঙ্গে দেখা হল! তুমি কখনো আমাকে ভালোবাসনি!'

দরজার দিকে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল জাকির:

'হ্যাঁ, ঠিক যেমন তুমিও আমাকে ভালোবাসনি...'

দরজাটা জোরে বন্ধ করল না সে, ভেজিয়ে দিল।

কারখানার প্রাঙ্গণে জাকির খুব জোরে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে চলল, যেন এ্যাসফল্ট, মাটি, পায়ের নিচে সবকিছু

ভেঙেচুরে দিতে চায়। ঠোঁটদুটো চাপা কঠিনভাবে। মনে হল ভারি একটা বোঝা এইমাত্র ছুঁড়ে ফেলেছে, কিন্তু তাতে আরাম হল না, বুকটা টনটন করছে, যেন ছিঁড়ে গিয়েছে। কেন? নক্‌সা-বিভাগে একজনকে কাঁদিয়েছে বলে? না, তার চোখের জল, তার মুখের হাসি তাকে আর স্পর্শ করে না, বরং বিরক্তির উদ্রেক করে। কিন্তু তাহলে কেন?

কেন সে জানে। সে মুহূর্তগুলির কথা মনে পড়লে বুকটা মুচড়ে ওঠে। জীবনে এর আগে নিজেকে কখনো সে এত ঘেন্না করেনি। দরজায় ভীরু একটা টোকা, ও ঢুকল; আর সে নিজে চোরের মতো চট করে সরে এল জারাঙ্গিসের কাছ থেকে, যেন কিছু-না এমন একটা ভানের চেষ্টা তার; আর ওর সরাসরি স্বচ্ছ দৃষ্টি, বরাবরকার মতো বিষণ্ণ — না তার চেয়েও বিষণ্ণ! আর সেই চেনা হাসির করুণ ছায়ায় ছোট্ট স্বচ্ছ মুখের এক কোণ অল্প বেঁকে উঠল! আর সেই অস্ফুট কথা: "বিরক্ত করেছি বলে কিছু মনে কোরো না..." তার চোখে চোখ রাখার সাহস তার হয়নি... কেন? সে তো বলে দিয়েছিল যে সব শেষ? শেষ দেখার সময় সে যা বলে তা স্পষ্টভাবে মনে পড়ল, এত স্পষ্টভাবে যেন ব্যাপারটা ঘটেছে মাত্র গতকাল: সে বলে যে ভেবেচিন্তে দেখা দরকার, নিজেকে যাচিয়ে দেখা দরকার, হয়ত সে এখনো তাকে ভালোবাসে, আবার ফিরবে তার কাছে। তখন কতটা সম্মানবোধ ছিল নিজের মধ্যে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে সে যা করেছে তা ঠিক। তারপর? আসলে কী

দাঁড়াল ব্যাপারটা? কাপুরুষের মতো ঝট করে একপাশে সরে যাওয়া, মিথ্যা আর অপমান! দেখা গেল যে ভেবেচিন্তে দেখার, নিজেকে যাচাই করার কিছু তার ছিল না — সে কিছুমাত্র বাছাই করেনি, শুধু স্রোতে ভেসে ওই মেয়েটার জালে পড়ে অসহায়ভাবে ঝটপট করে আটকা পড়েছে তার কাছে। আর সে জানে যে মেহ্‌রিবান তক্ষুণি সবকিছু বুঝেছে, ঘরে ঢুকে দেখামাত্র সব বুঝেছে... গোল্লায় যাক সব! হয়ত এইই ভালো! কী আর হবে? বড়ো জোর, ওর আর কোনো আশা থাকবে না!

জাকিরের মন একেবারে বিগড়ে গিয়েছে। কার উপরে এবং কেন তার এত তিক্তটা নিজেরি কাছে ধরা পড়ল না। এই উদ্‌ভ্রান্তি তার এত স্বভাববিরুদ্ধ যে মনে হল একমাত্র উপায় হল সবকিছু তৎক্ষণাৎ টুকরো টুকরো করে ফেলা, কিছু না ভেবে, কিছু না বেছে। বুকে একটা অশান্ত যন্ত্রণা, মনে শুধু একটি মাত্র বাসনা — দুটো মেয়েকেই নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া, তাদের কথা না ভাবা।

দৈবাৎ চোখ তোলাতে আকাশে দেখল ধোঁয়া — চুল্লিগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না তার দুর্লক্ষণ। উদ্‌ভ্রান্তি আর বিরক্তির হাত থেকে মুক্তির একটা পথ মিলল। দ্রুতপায়ে জাকির চলল, রাগ যেন মিইয়ে না যায়, ছুটে যন্ত্রচালনা কেন্দ্রে গিয়ে দড়াম করে দরজা খুলল... কে যেন কঁকিয়ে উঠে লাফিয়ে সরে গেল দরজা থেকে। জাকিরের উন্মত্ত চোখে পড়ল

নীল পোষাক গায়ে ছোটখাটো, একেবারে কিশোরী একটি মেয়ে; যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে একহাতে দরজায় চেপে যাওয়া পাটা ধরে অন্য পায়ে লেংচিয়ে সরে গেল সে। মেয়েটি এ্যাপ্রেণ্টিস। দেখে মনে হল অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছে, পাথরের ঘায়ে পড়ে যাওয়া পাখির মতো চেহারা। কিন্তু সে মুহূর্তে জাকিরের অন্তরে করুণার লেশমাত্র ছিল না।

'সরে যান এখান থেকে!' ক্রুদ্ধস্বরে সে বলল, 'কাজের সময় ঠিক জায়গায় থাকা দরকার!'

... আবার কারখানার কাজে আপ্রাণ লাগল জাকির, কিন্তু মনের সেই অস্থির অশান্তির হাত থেকে রেহাই পেল না। ঝড়ের আগে হয় এমনটা: জগদ্দল মেঘ মাথার উপরে উদ্যত, ধূলোভরা গুমোট আবহাওয়ায় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, দূরে আসন্ন ঝড়ের গুরুগুরু ধ্বনি, কিন্তু বহু প্রত্যাশিত বারিধারা, যার পর চারিদিক স্বচ্ছ সতেজ হয়ে উঠবে, আকাশ নীলে নীল হয়ে যাবে সেই বারিধারা আর নামে না। ঝড়ের আগেকার সেই হাঁপধরা অবস্থায় ক্লান্ত অবসন্নভাবে জাকিরের দিন কাটতে লাগল, যতদিন না হাকিম দাদাশ ও ইমামভের্দির কাজের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উৎসব এসে পড়ল।

অবশ্য দুজনের কর্মজীবন ঠিক সমান নয় — একজন এরিমধ্যে পঞ্চাশ বছরের বেশি কাজ করেছে, আর একজনের দুমাস বাকি, কিন্তু বন্ধুদের পক্ষে এ ব্যবধানের কোনো অর্থ নেই, তারা দুজন নিজেদের দীর্ঘ জীবনে বরাবর একসঙ্গে

থাকায় অভ্যস্ত — কি আনন্দ কি দুঃখের দিনে। তাই কারখানার ক্লাবে দুজনের জন্য একসঙ্গে উৎসবের আয়োজন করা হল।

মঞ্চে উপহার এসে পড়ছে অবিশ্রাম স্রোতে। বৃদ্ধদের সামনের টেবিলে যেন অলক্ষিতে জড়ো হচ্ছে উপহার, ছোট্ট, বড়ো নানা জিনিস — ফুলের তোড়া আর মালা, ফুলদানি, পোর্টফোলিও আর নাম-লেখা সুন্দর ফাইল। হলে যারা বসে আছে আর বাইরে যারা দাঁড়িয়ে তাদের মাথার উপর দিয়ে উপহারের স্রোত বয়ে এসে থামছে শুধু যে ঘাটে সেটা হল সভাপতিমণ্ডলীর টেবিল। শেষ পর্যন্ত টেবিলটা উপহারে এত ভরে গেল যে সভাপতিদের মুখ আর দেখা যায় না, আর যখন বিরাট চীনে ফুলদানিটি নিয়ে এল তখন বৃদ্ধ দুজন আড়ালে পড়ে গেল। তখন উপহারগুলো নামিয়ে মেঝেতে আর পাদপ্রদীপের কাছে রাখা হল। উপহারগুলো চাঁদা করে কেনা, আর কারখানার নানা বিভাগে ও ডিপার্টে তো লোকের অভাব নেই, তাই কয়েকটা খুব বেশি দামের। বৃদ্ধদের মনোযোগ সবচেয়ে আকর্ষণ করল ব্রোঞ্জে-গড়া অশ্বারোহী চাপায়েভের একটি মূর্তি। ছোট্ট ছোট্ট মূর্তিগুলির বেশির ভাগ গৃহযুদ্ধের বিষয়ে, বৃদ্ধদের গরীয়ান বিপ্লবী অতীতের প্রতীক চিহ্ন।

অভিনন্দন জানানো টেলিগ্রাম পড়া হল। বিস্তর টেলিগ্রাম এসেছে, এসেছে গ্রজনির তৈলকর্মী আর দনবাসের মজুরদের কাছ থেকে, এসেছে মস্কো থেকে। যারা পাঠিয়েছে তাদের অনেকে হাকিম দাদাশ ও ইমামভের্দিকে কখনো চোখে দেখেনি,

অনেকে আবার তাদের সযত্ন তদারকে শ্রমের পাঠশালা থেকে বেরিয়েছে — ছাত্ররা এখন মিস্ত্রী, ইঞ্জিনিয়র, বিজ্ঞানী। বৃদ্ধরা বীজ, আর এরা নবীন অঙ্কুর। সে বীজ মাটির গভীরে যায়, কারও চোখে পড়ে না; সহজ সাধারণ বৃদ্ধদের কে জানত, নিজেদের কারখানায় সাধারণ কাজ করে গিয়েছে তারা। কিন্তু তারা না থাকলে এমন অদ্ভুত অঙ্কুর তো হত না, দেশময় ফুল ফুটত না এত।

বৃদ্ধদের সবচেয়ে ভালো লাগল একটি উপহার: এইমাত্র সেটা নিয়ে এসেছে কারখানার সাহায্যপ্রাপ্ত কারিগরি স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা। তারা পুরনো তিন নং যন্ত্রাগারটার একটা মডেল সুন্দরভাবে গড়েছে; ক্ষুদে মজার বিনুনীওয়ালা এক রত্তি একটি মেয়ে উপহারটা দিল। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বৃদ্ধরা পালা করে চুম্বন করল মেয়েটিকে, সে তখনো উপহার নিয়ে সলজ্জভাবে দাঁড়িয়ে।

মঞ্চে সবার শেষে গেল জাকির। মাইক্রোফোন খারাপ হয়ে গিয়েছে বলে সে বক্তৃতা-মঞ্চে গেল না। নিজের ডিপার্টের উপহার — মার্বেলের সিংহসুদ্ধ দুটো একধরনের দোয়াতদানি টেবিলে রেখে বৃদ্ধদের করমর্দন করে তাদের অভিনন্দন জানাল, সবায়ের মতো তাদের দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য কামনা করল।

ইমামভের্দির গোঁফজোড়া ক্রূর হাসিতে নড়ে উঠল।

'হ্যাঁ, তোমার নতুন যন্ত্রাগার যতদিন না খাড়া হচ্ছে ততদিন টিকে থাকার চেষ্টা করব বই কি,' উত্তরে বলল সে।

'বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না,' হেসে বলল জাকির।

'কে জানে!' কিঁচকিঁচে গলায় বলে উঠল হাকিম দাদাশ। 'শুনছি তুমি নাকি হালে ওটাকে ছেড়ে দিয়েছ... আর আমাদের কী তাড়া না লাগিয়েছিলে...'

'লোকে তো হামেশা কিছু না কিছু বলাবলি করে,' বিরক্ত হয়ে বলল জাকির। কথাগুলো বলার সময় সে আগেকার মতোই বৃদ্ধদের হাত ধরেছিল যন্ত্রবৎ। তাই দর্শকদের মনে হল তাদের মধ্যে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার বিনিময় চলেছে।

'পুরনো যন্ত্রাগারটার জন্য আমার ওপর আপনাদের রাগ এখনো পড়েনি?'

'যন্ত্রাগারের জন্য নয়, আমাদের নিজেদের জন্য...' তাকে বাধা দিয়ে বলল ইমামভের্দি।

'জোরে কথা বলুন, জোরে!' হল থেকে চেঁচাল। 'কিছু শোনা যাচ্ছে না!'

'এ বিষয়ে আপনারা হয়ত জোরে কথা বলবেন?' চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বৃদ্ধদের জিজ্ঞেস করল জাকির।

'তা জোরে বলা চলে বই কি। আমাদের তো এখুনি বক্তৃতা দিতে হবে, বন্ধুদের অভিনন্দনের উত্তর দিতে হবে...' ইমামভের্দি বন্ধুর দিকে ফিরল। 'কে উঠবে, তুমি না আমি?'

'আমি? এই গলায়?' কিঁচকিঁচ করে বলে উঠল হাকিম দাদাশ। 'তুমি বল...'

ইমামভের্দি বেশ চালের মাথায় সার্ট আর রুপোর কাজ করা বেল্টটা ঠিক করে নিয়ে গোঁফে চাড়া দিল, তারপর বুক চিতিয়ে গেল বক্তৃতা-মঞ্চে। মুখর অভিনন্দনে, হাততালিতে সমস্ত হল ফেটে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে, অদৃশ্য অর্কেস্ট্রায় বেজে উঠল একটা সুর — এটাও অপ্রত্যাশিত। হাততালি দিতে দিতে জাকির পিছু হটে মঞ্চ থেকে নেমে প্রথম সারিতে বসল। বৃদ্ধদের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি, যেটা সে করেছে বলতে গেলে ঠাট্টাচ্ছলে, যে কোনোক্রমে তাদের বক্তৃতায় স্থান পাবে না সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ, আরো বেশি করে এইজন্য যে উৎসব সন্ধ্যায় অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ লোকে তোলে না। এ কথাবার্তার জের টানা চলে পরে, অন্য অবস্থায়। তাই যখন পূর্ণ স্তব্ধতার মধ্যে ইমামভের্দি অনুচ্চ কণ্ঠে কিন্তু স্পষ্টভাবে তার নাম করল তখন আরো বেশি বিচলিত লাগল তার। ইমামভের্দি বলল:

'হ্যাঁ, তাহলে কমরেড জালালভের অনুমতিক্রমে আমি বলতে চাই: আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে সবচেয়ে বড়ো কথা হল প্রত্যেকটি কর্মীকে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা করা, প্রত্যেকের মধ্যে মানুষকে দেখা। নিজের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে অন্যকে হেয় করা উচিত নয়! আমি আর হাকিম দাদাশ, আমরা কে? সাধারণ শ্রমিক, অসামান্য কিছু করিনি, নিজেদের কারখানায় সৎভাবে পঞ্চাশ বছর খেটেছি শুধু, আর কিছু

নয়। কখনো ভাবিনি যে এর জন্য আমাদের এমন সম্মান দেখাবে, এমন বাহবা দেবে যা আমরা নিজেরাই দিতে পারি না (হলে হাসির শব্দ)। এইমাত্র চেঁচিয়ে লোকে আমাদের আরো জোরে কথা বলতে বলল, জানতে চাইল কমরেড জালালভের সঙ্গে কী আলাপ চলেছে। জানালে তার আপত্তি নেই, আছে কি, কমরেড জালালভ?' প্রথম সারিতে চোখ বুলিয়ে জাকিরকে না দেখে ইমামভের্দি বলে চলল। 'অবশ্য, এ সব নিয়ে কথা বলে না উৎসবের সময়, তবু আমার মনে হয় এটা কমবয়সীদের কাজ দেবে, তারা তো এইমাত্র জীবন শুরু করেছে, তাদের সামনে এখন সুদীর্ঘ পথ। আপনারা সবাই জানেন কেমন করে পুরনো যন্ত্রাগারটা সরানো হয়, কেন সরানো দরকার হয়ে পড়ে। আমরা দুজন পুরনো কর্মী, অর্ধেক জীবনের বেশি কাজ করেছি ওখানে, বুড়ো হয়েছি ওটার সঙ্গে, তাই ভাঙার সময় ভয়ানক খারাপ লাগে। জালালভ অবশ্য ঠিক, সে আরো দরকারী জিনিসের কথা ভাবে, আমাদের যন্ত্রাগার সরানোর অধিকার তার ছিল। কিন্তু আমাদের সরাবার, মানুষকে সরাবার অধিকার নেই ওর। আমাদের সঙ্গে ওর ব্যবহারটা নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন; আপনারা তো শুনেছেন কী ভাবে ও আমাদের সঙ্গে কথা বলে, আমাদের যেন মানুষ বলে গণ্য করেনি! আর এখন মনে হচ্ছে, বলতে গেলে সারা দেশ আমাদের সম্মান জানাচ্ছে! আমরা ভেবেছিলাম পরে ও নিশ্চয়ই ভেবে দেখবে, ক্ষমা চাইবে — কিন্তু ভেবে দেখেনি ও! ভেঙে

ফেলা দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে কী কষ্টটাই আমরা পেয়েছিলাম বলতে পারি না। সবাই সেটা দেখে, বোঝে, আমাদের কাছে আসতে সবাই বেদনা পায়, মৃত'র আত্মীয়দের কাছে আসতে লোকের কষ্ট হয় যেমন। কিন্তু জালালভ আসেনি অন্য কারণে — ও উদাসীন, আমাদের অন্তরে কী চলেছে তা নিয়ে ওর মাথাব্যথা ছিল না। কতবার আমাদের সামনে দিয়ে গেল, কিন্তু আমাদের দিকে দৃকপাত পর্যন্ত করল না। কমরেড জালালভ, এভাবে লোককে পায়ে দলে যাওয়া অন্যায়, ভয়ানক অন্যায়! তোমার বয়স এখনো কম, কোথা থেকে তুমি পেলে এমন প্রাণহীন হৃদয়, লোকের প্রতি এমন ঔদাসীন্য, সোজা কথায় বলতে গেলে এমন নিষ্ঠুরতা!'

জাকিরের সহ্য হল না। ভয়ঙ্কর ক্ষেপেছে সে, সামলাতে পারছে না নিজেকে। ঠাট্টার সুর আনার চেষ্টা করে সে চেঁচিয়ে বলল:

'কী করা উচিত ছিল আমার, হাত ধরে ওখান থেকে আপনাদের নিয়ে যাওয়া?'

'হয়ত তাই...' না চটে জবাব দিল ইমামভের্দি। 'একটি লোক এসে তো তাই করল। তাকে ধন্যবাদ জানাই। লোক নয়, একটি মেয়ে। তাকে আপনারা চেনেন, আমাদের টেলিফোনে কাজ করে। ছোট্ট পাতলা মেয়ে, মাথায় বিনুনি। তার মধ্যে অসাধারণ কিছু নেই, ঠিক আমাদেরি মতো মানুষ। তখন নিজের ব্যবহারে কেমন করে সে আমাদের অন্তরকে উষ্ণ করে

তোলে! আর সত্যি, আমাদের হাত ধরে নিয়ে যায়। হাত ধরে, কমরেড জালালভ, হাত ধরে! তাকে ধন্যবাদ! আমার কোনো সন্দেহ নেই যে ওর মতো মানুষ সারা জীবনে অনেক লোকের কাছ থেকে ঠিক এমনি আন্তরিক ধন্যবাদ পাবে। পাবে লোকের প্রতি মানুষের মতো ব্যবহারের জন্য, পাবে নিজের দরাজ উষ্ণ অন্তরের জন্য! আর আমি বিশ্বাস করি যে অনেক বছর পরে ও এ হলে আসবে, চুলে তখন পাক ধরেছে, আর ওকে ঠিক আমাদেরি মতো সম্মান জানাবে, হয়ত আরো বেশি সম্মান জানাবে!'

সমুদ্রের জোয়ারের মতো মুখর হয়ে উঠল হল, করতালি, চীৎকার, মঞ্চের দিকে গড়িয়ে গেল মানুষের জীবন্ত স্রোত, লোকে টুপি আর রুমাল ছুঁড়ল, ফুল ছুটল চারিদিকে। টেলিফোনের মেয়েরা মেহ্‌রিবানকে ঘিরে মহা উত্তেজনায় চেঁচিয়ে বলল: 'উনি তোমার কথা বলছেন, মেহ্‌রিবান, তোমার কথা বলছেন!' মাহ্‌বুবা ও নাজিলা তার হাত ধরে লোকের উত্তাল ভিড় থেকে নিয়ে গেল হলের বাইরে। সেখানে ভিড় আর হট্টগোলের মধ্যে টেলিফোনের অন্য সিফ্‌টের মেয়েরা তাদের খুঁজে বের করল, সবাই ঘেঁষাঘেঁষি করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আর পোষাক ঠিক করে নিতে লাগল। আশেপাশের লোকের কথা ঠিক কানে আসছে না মেহ্‌রিবানের, তাদের দেখছে ঝাপসা চোখে। ঠেলাঠেলিতে কখন বান্ধবীদের কাছ থেকে সরে এসেছে, লাউঞ্জের ভিড় কখন কমে গেছে, জলসা শুরুর

ঘণ্টা বেজে উঠেছে, একবার, দুবার, তিনবার — কিছুরই খেয়াল নেই তার। লাউঞ্জ ফাঁকা হয়ে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেও যাবে — হঠাৎ কে পথ আটকাল যেন। আয়নার বুকে, তার দিকে অর্ধেকটা ফিরে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জাকির...

"চোখ সরিয়ে নেব! তাকাব না, তাকাব না!" কিন্তু না তাকিয়ে সে পারল না। "ঘুরে দাঁড়াব — সোজা যাব ওর কাছে!" না, তাও সে পারে না। "কিন্তু আয়নায় যে ছবিটা পড়েছে সেটা তো আর আসল লোক নয়, সেটা আমি দেখতে পারি!"

হায় দর্পণ, অমোঘ দর্পণ, অনেক গোপন কথা জানিয়ে দেয় দর্পণ, যে কথা অনেক সময় লোকে জানতে চায় না! আয়নায় কিশোরী প্রথম বুঝতে পারে সে যৌবনে পা দিয়েছে, আয়নাতে ধরা পড়ে প্রথম পাকা চুল, প্রথম বলিরেখা। সেই আয়না মেহ্‌রিবানের কাছে একটি গোপন কথা বলে দিল: বলিষ্ঠ সুন্দর শক্তিমান জাকির, এক কালে তার স্বপ্নের দোসর যে জাকির, আয়নাতে তার প্রতিচ্ছায়া সম্পূর্ণ অন্য রকমের। সে মানুষ আর নেই। ভেঙ্গে পড়েছে, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। গতানুগতিক, সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঞ্চ থেকে তাকে ধমকানো যায়, অপ্রিয় সত্য কথা বলা যায় মুখের উপর, তাতে সে চটতে পারে, কিন্তু জবাব খুঁজে পায় না।

আর আয়নায় জাকিরের কাছে অন্য একটি গোপন কথা ধরা পড়ল। মেহ্‌রিবানের পিছন দিকের আয়নায় অবিশ্রাম

প্রতিচ্ছায়া পড়ছে মেয়েদের, সে ছায়া আয়নার স্ফটিক স্বচ্ছ গভীরে দূরে, ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। অনেক মেহ্‌রিবানকে দেখল জাকির, নিমেষের জন্য মনে হল ওরা সবাই সত্যি, সংখ্যায় অনেক আর সবাই জীবন্ত, বাস্তব। মেহ্‌রিবানের সম্বন্ধে ইমামভের্দির কথাটা মনে পড়ল: "ঠিক অন্যদের মতোই।" আর সে অনুভব করল যে শুধু মেহ্‌রিবানকে নয়, অন্য সব মেয়েকেই সে অপমান করেছে। এক রকম দেখতে সবাই, তার সামনে ও পিছনে অন্তহীন সার বেঁধে তারা দাঁড়িয়ে আছে। তার কানে হঠাৎ বেজে উঠল ব্যথার অস্ফুট আর্তনাদ... কার আর্তনাদ? সেই ছোট্ট এ্যাপ্রেণ্টিস মেয়েটির, যার পা সেদিন সে দরজা দিয়ে দাবিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটিও ব্যথা পায়। আর আয়নায় যে সবচেয়ে আগে দাঁড়িয়ে আছে তার স্বপ্নকে সে পদদলিত করেছে। "লোককে পায়ে দলে যাওয়া অন্যায়..." দলেনি সে, জীবনে নিজের পথ করে চলেছে শুধু। আর তার অন্তরে দুরন্ত একটা প্রতিবাদ জেগে উঠল, ইচ্ছে হল যা কিছু তাকে তার খুশি মতো বাঁচতে বাধা দেয় তা ছুঁড়ে ফেলে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেয়! কিন্তু হয়ত তা করার অধিকার তার নেই?

হঠাৎ আয়নার প্রতিফলিত সমস্ত মেয়েগুলি দুলে উঠল, মিলিয়ে গেল। আয়না থেকে সরে এসে মেহ্‌রিবান হলে যেতে যেতে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল...

তার কাছে গেল জাকির।

কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারল না দুজন। শেষে জাকির শুরু করল আড়ষ্ট গলায়:

'ইমামভের্দি কি তোমার কথা বলল?'

মাথা অল্প পিছনে হেলিয়ে মেহ্‌রিবান সোজা তার দিকে তাকাল।

'আমি একেবারে ভাবিনি যে এ নিয়ে কথা বলবে। বলাটা উচিত হয়নি। আরো উচিত হয়নি তোমাকে নিয়ে বলাটা...'

'না, আমার মতে, না বলে পারেনি। বলার অনেক কারণ আছে। প্রথম এবং সবচেয়ে বড়ো কারণ হল আমাদের আগেকার সম্পর্ক...'

'সে কথা উঠবে কেন?' নিরাসক্ত গলায় প্রতিবাদ জানাল মেহ্‌রিবান; জাকিরের মনে হল নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ তুলেছে। কিন্তু সেটা ছেড়ে দেবার মনোভাব তার নেই।

'কারণ... তোমাদের সিমুজার হাকিম দাদাশের মেয়ে।'

'সিমুজারের কথা ওঠে কী জন্য?'

'সিমুজারের জন্যই আমাদের দুজনের আলাপ হয়। যেদিন তোমার ওপর তম্বি করি সেদিনই আমার কাছে এসে সিমুজার জোর দিয়ে বলে যেন আমি তোমার কাছে মাপ চাই। তা থেকেই সব শুরু...'

'সিমুজার? আমি কখনো ভাবিনি যে...'

'হ্যাঁ, সিমুজার! আর হয়ত ও বাপকে বলে যে আমাদের দুজনের ভাব হয়েছে। এখন বুঝেছ তো যে তুমি...'

'তোমাকে বাধা দিচ্ছি?'

'হ্যাঁ, দিচ্ছ,' নিষ্ঠুরভাবে বলল সে। 'তোমার জন্য আমাকে খালি লোকে দোষ দেয়, তোমার জন্য কারখানায় লোকে আমার সঙ্গে আগেকার মতো ব্যবহার করে না।'

চিন্তিত ও স্বচ্ছ চোখে তার দিকে তাকাল মেহ্‌রিবান, ঠোঁটে এল ক্ষীণ একটা বাঁকা হাসি। একটা অপ্রীতিকর তুলনা তার মাথায় এল:

'জানো, তোমাকে দেখে এখন বাবার কথা মনে হচ্ছে। তিনিও হামেশা ভাবতেন যে আমি তাঁকে বাধা দিচ্ছি। ভেবেছিলাম যে এখানে কারখানায় শেষ পর্যন্ত লোকের কাজে আমি লাগব, কিন্তু দেখছি, এখানেও বাধা দিচ্ছি...'

হলে যেতে গিয়ে গেল না মেহ্‌রিবান, হঠাৎ ঘুরে বহির্পথের দিকে চলে গেল। জাকিরের চোখে পড়ল যে, প্রথম মিলনের দিনে যে পোষাকটা তার গায়ে ছিল সেটাই আজ সে পরেছে। আপনা থেকে চোখ পড়ল কাঁধে। রিপু-করা জায়গাটায়, যেখানে সেদিন তার কর্কশ হাতে হালকা সিল্‌ক্‌ ছিঁড়ে যায়, আবার জোড়াতালির ক্ষীণ ছোপ একটা... ঘায়ের দাগের মতো।

দরজার শব্দ। চমকে উঠল জাকির।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসেছে মেহ্‌রিবান। চেনা সব প্রখর শব্দ আর আওয়াজ — বাষ্পের নিশ্বাস আর রেলপথে চাকার খটখট। গাড়ির ভিড়সুদ্ধ কারখানার রাস্তার জীবনপ্রবাহ,

কিছুতে তার হুঁশ নেই। এত আত্মমগ্ন সে যে কোনো শব্দ কানে আসছে না। দালানের দেয়াল ঘেঁষে চলেছে। ঝকঝকে আলোকিত রাস্তা হয়ে সে চলল শীতকালীন সাঁতার পুকুরের থামওয়ালা সুন্দর বাড়িটার দিকে। স্কোয়ারের মাঝখানে পেট্রোল পাম্পের স্টেশন আর ডাইনে তেল-সাঁকোর কালো মাকড়সার জাল চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দিল। মনে হল এখানটায় সবাইয়ের নজরে পড়বে সে। তাই ঘুরে সে নেমে চলল সমুদ্রের দিকে। লেসের রুমালের কোণটা মুড়তে মুড়তে চলল মন্থরগতিতে। যে গলি ধরে চলেছে সেটা চলাচলের পথ নয়। পাথর দেয়ালের মধ্যে একটা সরু ফালি। একটু এগোতেই দেয়ালের নিচ থেকে বেরিয়ে-আসা একটা মোটা পাইপে পথ আটকাল। মেহ্‌রিবান জানে যে পাইপটা সটান সমুদ্র পর্যন্ত গিয়েছে, পাইপ হয়ে সমুদ্রের জল আসে কনডেনসেটরের জন্য। পাইপে উঠে পাইপের পেট বেয়ে সে চলল যন্ত্রচালিতের মতো টাল সামলাবার চেষ্টা করতে করতে।

"কোথায় চলেছি?" এত কাছে কাছে মনে হচ্ছে নোঙর ঘাটের আলো, সে দিকে আর সমুদ্রের বুকে চূর্ণ জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে শুধাল সে। সেদিনও জ্যোৎস্নার বান ডেকেছিল পারাপেটের ওদিকের রাস্তাটায়, সেদিনও ঠিক এমনি আলোর দপদপানি... একেবারে কাছে, কানে বেজে উঠেছিল তার উত্তপ্ত অস্ফুট ফিসফিসানি: "আমি তোমায় ভালোবাসি, মেহ্‌রিবান, ভালোবাসি!" কী মিথ্যে কথা!

...পেছনে হঠাৎ হালকা পায়ের দ্রুত শব্দ, যেন তাকে ধরার চেষ্টা করছে কেউ। ফিরে তাকাতে গিয়ে দুলে উঠল মেহ্‌রিবান, আর একটু হলে পড়ে যেত। কিন্তু দেয়ালে হাত দিয়ে টাল সামলাল। মনে হল, হয়ত হাওয়ার শব্দ শুনেছে। কে আসবে পিছু পিছু, কে তাকে ধরার চেষ্টা করবে? জাকির? তার কাছে সে এখন আসতে যাবে কেন? আসার তো কোনো কারণ নেই।

মেহ্‌রিবান পাইপ হয়ে আবার চলল, গোল পিঠটায় পা ফসকে না যায় সেদিকে তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ। না, পেছনে কেউ আসছে না। প্রথমে তাতে অল্প হতাশ লাগল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্তি বোধ করল মেহ্‌রিবান। এই ভালো — একলা। ওকে এখন দেখলে অসহ্য লাগত।

"কিন্তু কী করি, কী করি এখন?" মনে মনে সে বলে চলল, কথাগুলোয় কোনো অর্থ আরোপ না করে, পাইপ হয়ে চলা না থামিয়ে আপনা থেকে টাল সামলিয়ে। "কারখানা ছেড়ে দেব? ওকে বাধা দিচ্ছি বলে ছেড়ে দেব? তাছাড়া, কারখানা ছেড়ে দিলে সবকিছু ভুলে যাওয়া সহজ হবে, সবকিছু ভুলে যাওয়া!"

সবকিছু শুরু হয় টেলিফোনে তার প্রতি জাকিরের হুঙ্কারে, কারখানা থেকে ছাড়িয়ে দেবার হুমকিতে, আর শেষ হচ্ছে প্রায় সেই ভাবেই: জাকির বলল: "তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ!" চাকা পুরো ঘুরেছে। তার আগে চক্রমণ পথে একসঙ্গে

দুজনের সময় কী অপরূপে না কাটে — প্রেম, স্বপ্ন, দীপ্ত আশা আর অশ্রুর উচ্ছ্বাস। কিন্তু শুরু আর শেষ এক গ্রন্থিতে বাঁধা, আর জাকির নির্মমভাবে সেটা ছিন্ন করল।

অসুবিধাজনক সেই কুঁজো দীর্ঘ পাইপ পথ হয়ে একেবারে সমুদ্রতীর পর্যন্ত মেহ্‌রিবান গেল, পা ফসকাল না একবারও। কী সহজে পেঁাছিয়েছে ভেবে সে নিজেই অবাক। বরাবর একটা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন ছিল পাশে — কারখানার দেয়ালটা — সেজন্য হয়ত?

পাইপটা সমুদ্রতীরে থামেনি, সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। মনে হয় সেটা প্রসারিত সমুদ্রের আরো গভীরে যেখানে চাঁদের আলোর হাতছানি। হালকাভাবে সাবধানে পাইপ থেকে লাফিয়ে নামল মেহ্‌রিবান, পায়ের তলায় ঠেকল নরম বালি। পাইপে বসে চারদিকে তাকাল — কেউ নেই। একেবারে জলের ধারে উদ্যত হয়ে আছে ভাঙা নোঙরস্থানের কালো খুঁটি, পুরোনো ঘাটের অবশিষ্টাংশ। অদূরে কোথাও যেন ট্যাঙ্কারের গুরু তীক্ষ্ন আওয়াজ; কানে এল কণ্ঠস্বর আর নোঙরের শেকলের শব্দ।

"এখানে এলাম কেন? না, ওখানে থাকা চলত না। কী কঠিন, কী অসহ্য! বরাবর চলবে এ-রকম? এখন কোথায় যাই?"

নিজের বড়ো ফাঁকা ঘরটার কথা ভাবল মেহ্‌রিবান, যেখানে রাতে কে যেন নিশ্বাস নেয়। সেখানে যেতে তার মন

সরল না, ঠাকুমার মৃত্যুর পর বাড়িটা এত অচেনা আর অস্বস্তিকর। আচ্ছা, ওখানে রাতেকার সেই অদ্ভুত শ্বাসপ্রশ্বাস আর শোনা যায় না হয়ত? তাকে ভয়-পাওয়ানো শব্দগুলি হয়ত তার স্বপ্ন দোসরের কণ্ঠস্বরের আত্মীয়, যে দোসর তার নিঃসঙ্গতায় কথা বলত তার সঙ্গে? মেহ্‌রিবান এখন বুঝল যে প্রায় শিশুসুলভ তার সেই পুরনো ভয় আর আনন্দ আর কখনো ফিরবে না... মনে হল আজ সন্ধ্যেবেলার মধ্যে তার বয়স অনেক বেড়ে গিয়েছে, আর এর আগে অনেক কিছু যা তার কাছে পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস বলে ঠেকত, এখন সে দেখল অনুকম্পার চোখে, তিক্ত হাসিতে।

একের পর এক এসেছে কর্মদিন, সমুদ্রতীরে জাকিরের সঙ্গে উচ্ছ্বাস ও আনন্দে ভরা সন্ধ্যা; জীবনের অভিজ্ঞতা যতদিন সে সঞ্চয় করেছে, টেলিফোনের সুইচবোর্ড আর কারখানায় আশেপাশের লোকজনে অভ্যস্ত হয়েছে, যতদিন নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত হতে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে, আর নিজে ক্রমশ বদলে গিয়েছে, ততদিন কল্পনার সাথী ঠিক সেরকমটি থেকেছে যেরকমভাবে মেহ্‌রিবান তাকে ভাবে তেরো বছর বয়সে। পাশে কেউ না থাকলে ঠিক আগেকার মতোই সেই সব কথা সে বলে মেহ্‌রিবানকে। আর এখন সে কথায় তার কোনো সান্ত্বনা নেই। রাতারাতি সে বড়ো হয়ে উঠেছে, নিজের স্বপ্নের তদারকি থেকে ছাড়া পেয়েছে। স্বপ্নকে ছাড়িয়ে উঠেছে সে, যেমন করে কিশোরীরা পুরনো পোষাক

ছাড়িয়ে ওঠে, যে পোষাক তারা কতদিন কত অনুরাগভরে পরেছে তা এখন পরলে লজ্জা হয়, হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে না যে। পুরনো পোষাক সহজে ফেলে দিয়ে নতুন পোষাক পরা যায়, কিন্তু স্বপ্ন?

জীবন কঠোর। মেহ্‌রিবান ও জাকিরকে একসঙ্গে একই কারখানায় টেনে আনে সে, সেখানে প্রায় প্রতিদিন তাদের দেখা না হয়ে উপায় নেই; তাছাড়া মেহ্‌রিবানকে তো দিনে কয়েকবার ইয়ারফোনে তার গলা শুনতে হয়। অবশ্য এ কারখানা ছেড়ে অন্য কোনো কারখানায় সে যেতে পারে। কিন্তু তা কী করে হয়! এখানে প্রথম কাজ শিখেছে, লোকের কাজে লাগার অনুভূতি হয়েছে, এখানে অনেক অসুবিধা সহ্য করে পরে অনেক কিছু অর্জন করেছে। এখানে লোকে তাকে ভালোবাসে, তার কদর বোঝে। আজ ইমামভের্দি কী উচ্ছ্বাসভরে তার কথা বলেছে, তার প্রতি দুটি বৃদ্ধের মনোভাব, যাদের সে কাজ শিখিয়েছে সেই নতুন মেয়েগুলির সশ্রদ্ধ অনুরাগ — সব তার মনে পড়ল। সে এখান থেকে চলে যাবে কেন? জাকিরকে কি তার ভয়? না, কিন্তু বেদনা রয়ে গেছে।

এমন কি অত্যন্ত বলিষ্ঠ লোকেরাও বেদনা ভোগ করে।

আর সেই বেদনা বুকে নিয়ে, যেন সেই বেদনাই তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমনভাবে মেহ্‌রিবান ঝট করে পাইপের উপর লাফিয়ে উঠে তড়তড় করে চলল, এবারও পা ফসকাল না একবারও, শেষ পর্যন্ত দৌড়িয়ে সরু গলিতে নামল লাফিয়ে।

গলি পেরিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে, প্রধান দালানে ঢুকে করিডর হয়ে ঝড়ের মতো ঢুকল এক্স্চেঞ্জের কামরায়। তার উত্তেজনা তখন অসাধারণ, গলার স্বরে অদ্ভুত একটা ধ্বনি আর কম্পন, চেঁচিয়ে বলল:

'সবাই উৎসবে যান, মেয়েরা! অনেক কাজ হয়েছে!'

এক্স্চেঞ্জে সিফ্টের অর্ধেক মেয়ে শুধু, বাকিরা সন্ধ্যার উৎসবের জন্য ছাড়া পেয়েছে। ইয়ারফোন লাগানো মেয়েরা অবাক হয়ে মেহ্রিবানের দিকে ফিরল।

'নামুন শীগগির, আমি আপনাদের হয়ে কাজ করব,' বলল মেহ্রিবান, যে মেয়েটি তার জায়গায় বসেছিল তার ইয়ারফোন খুলতে খুলতে, তার গলার স্বর তখুনি ধীর হয়ে এসেছে।

'মেহ্রিবান, এ সিফ্টে তো আপনার কাজ নেই,' মেয়েরা আপত্তি করল।

'তাই বুঝি? এ আর কী? যান, চটপট সবাই যান জলসায়, ওখানে খুব মজা চলেছে! কারখানায় এ রকম অনুষ্ঠান কখনো হয়নি।'

সবাই তখনো ইতস্তত করছে দেখে সে আদেশের ভঙ্গীতে বলল:

'এখ্খুনি যান বলছি! আমি থাকছি।'

খুশি হয়ে মেয়েরা টুল ছাড়ল, ভয়ানক খুশি, রূপচর্চা চলল।

'আমরা সাজগোজ করে আসিনি, যেমন-তেমন পোষাক

পরে আছি,’ নিজেদের দেখতে দেখতে সখেদে বলল তারা।

বড়োর মতো ভাব দেখিয়ে তাদের উপর চোখ বুলিয়ে নিল মেহ্‌রিবান, মুখে এল তার সেই বেঁকা বিষণ্ণ হাসি:

‘সত্যি বলছি, মেয়েরা, জীবনের সবচেয়ে বড়ো কথা এটা নয় ...’

হালে মেহ্‌রিবানকে এখানে সিমুজারের ঠিক পরে মনে করা হয়। উচ্ছল মেয়েরা বকর বকর করতে করতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

মেহ্‌রিবান এখন একলা। ইয়ারফোন চাপিয়ে কলের উত্তর দিতে লাগল। কলের সংখ্যা কম।

তাকে লোকের দরকার, তাকে না হলে চলে না — আবার সেই আশ্বাসভরা অনুভূতি তাকে একাকার করে দিল। এক্‌স্‌চেঞ্জে একমাত্র সে আছে, সমস্ত কারখানার ভার তার হাতে, এটা ভেবে সে অত্যন্ত সজাগ। কলের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়ল, তাতে সে খুশি, কেননা তাহলে নিজের বেদনার কথা ভাবার সময় থাকে না, বেদনার জ্বালা কমে আসে।

এখান থেকে চলে যাবে? কারখানার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সূত্রে সে বাঁধা সে সূত্র ছিঁড়ে ফেলবে? কখ্‌খনো নয়! তার গোটা জীবন এইখানেই।

নাবিক যেমন সমুদ্র ছাড়া, বৈমানিক যেমন মহাকাশ আর ড্রাইভার যেমন সমান মসৃণভাবে ধেয়ে আসা পথ ছাড়া নিজের

জীবনের কথা ভাবতে পারে না, কারখানা ছাড়া তেমনি মেহ্‌রিবান আপনার জীবন কল্পনা করতে পারে না। কারখানা তার পথ, তার দূর সমুদ্র, তার মহাকাশ...

...উৎসবের হৈচৈ কমে এল, কিন্তু কারখানার কাজ ক্ষান্ত হল না। মেয়েরা খুব খুশি আর কৃতজ্ঞ, মেহ্‌রিবানকে ফোন করে এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জানাল জলসাটা কেমন চমৎকার জমে, কেমন তারা মজা করে; সবাই বলল এসে মেহ্‌রিবানকে ছাড়ান দেবে। কিন্তু মেহ্‌রিবান বলল তাদের ঘুমোনো দরকার।

'আর আপনি কেমন আছেন, মেহ্‌রিবান?' শুধাল তারা।

'চমৎকার আছি। একেবারে ক্লান্ত নই। এবার আপনারা বাড়ি যান! শুভরাত্রি!'

...একটা বাজে। গোটা সিফ্‌টে কাজ চলেছে, ক্রমাগত জ্বলে উঠছে সুইচবোর্ডের আলো, কিন্তু রাত্রে সহর থেকে কলের সংখ্যা আগেকার মতোই কমে এল।

হঠাৎ নিচু একটা আওয়াজ... সহরের লাইন। দীর্ঘ আওয়াজ... একবার... দুবার...

'তিন নং!' সাবধানে বলল মেহ্‌রিবান।

'মেহ্‌রিবান!' হতাশ কণ্ঠে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

মেহ্‌রিবান চমকে উঠল। জবাব দিতে গিয়ে নিজের সংযত শান্ত সুরের তারিফ করল সে:

'কী?'

সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে পারল না জাকির, মনে হল এত

উত্তেজিত যে কথা খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর হাঁপিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে জানাল যে সে সর্বত্র তাকে খুঁজেছে, সারা সহরে ছুটোছুটি করেছে, ভয় পেয়েছে যদি তার কিছু হয়ে থাকে। অনেক কথা বলল সে, এক কথা বারবার; সর্বনাশের হাত থেকে এক চুলের জন্য বেঁচে যাওয়া লোকে কথা বলে এমনভাবে। শেষ পর্যন্ত হাঁফ নিয়ে জাকির বলল:

'ধন্যবাদ তোমায়, মেহ্‌রিবান!'

'কেন?'

'সবকিছুর জন্য। তুমি যে আছ সেই জন্য, তুমি যে বেঁচে আছ সেই জন্য...'

...চোখের সামনে জ্বলে ওঠা আলো হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল, ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল...

জাকিরের এই উগ্র উৎকণ্ঠা আর এই মুখর আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে অন্য একটা জিনিস ধরা পড়ল মেহ্‌রিবানের সূক্ষ্ম বোধের কাছে। জাকির উৎকণ্ঠিত হয়েছিল নিজেরি জন্য — মেহ্‌রিবানের খারাপ কিছু হলে লোকে তাকে দোষ দিত; আর সে এখন খুশি, কেননা মেহ্‌রিবান বেঁচে আছে, তার কোনো বিপদ নেই। আর এটাই মোদ্দা কথা...

মেহ্‌রিবান জবাব দিল না।

আবার ফোন করল জাকির, কিন্তু মেহ্‌রিবান সাড়া দিল না। জবাব দিল অন্য সব কলের — ল্যাবরেটরি, ডেসপ্যাচ-ঘর, যন্ত্রচালনা বিভাগ, ঘাট, কিন্তু জাকিরের বেলায় সে বোবা।

জাকির প্রায় চেঁচিয়ে উঠল: 'মেহ্‌রিবান! জবাব দিচ্ছ না কেন? যা হোক কিছু একটা বল! মেহ্‌রিবান? মেহ্‌রিবান?' মেহ্‌রিবান কিন্তু নির্বাক, সুদূর।

...চোখের সামনে আরো জোরে কাঁপতে লাগল আলোগুলি, চারিদিকে একটা দীপ্ত প্রভা, তারপর ভাসা-ভাসা ছোপ ছোপ আলো। মেহ্‌রিবান কাঁদল। এ চোখের জল আনন্দের নয়, তপ্ত এ চোখের জল জ্বালা ধরিয়ে দেয়...

সেই আড়ষ্ট, যন্ত্রণাকর স্তব্ধতা নামল যা নামে দুর্বিপাকের ঠিক পরের মুহূর্তে, যখন কানে বেজে চলে বিকট শব্দ আর সাহায্যের জন্য চীৎকার — সেই আতঙ্ক আর ব্যথায় পরিপূর্ণ স্তব্ধতা যা জানিয়ে দেয় যে সব শেষ...

...হাঁফিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে চোখের জল মুছল মেহ্‌রিবান। সুইচবোর্ডে ক্রমশ বেশি করে জ্বলে উঠছে আলো। সে উত্তর দিতে লাগল·

'তিন নং.. তিন নং.. তিন নং...'

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

